দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ৪ ডিসেম্বর ২০১৭।। ১৭ অগ্রহায়ণ - ১৪২৪
যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

বক্স অফিসের কথা মাথায় রেখেই কি পদ্মাবতী বিতর্ক সৃষ্টি করলেন পরিচালক?

বিশ্ব বাংলা-র অধিকার কার ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৪ ডিসেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

গুজরাটে বিজেপি জিতছে, আসন সংখ্যা নিয়ে সংশয় ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : এক স্বয়ংসেবকের মৃত্যু এবং... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

মোদ্দা কথা বক্স অফিস, তার জন্য যে কোনো কুকর্ম করা যায় ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১২

সাক্ষাৎকার : গুজরাটবাসী বিজেপিকে ভোট দেবেন উন্নয়নের জন্য : বিজয় রূপানি ▯ ১৪

বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদক বাংলার পাতে মাছ জোগান দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৬

রুগ্ন ব্যবসা দেখিয়ে কর্মী ছাঁটাই বন্ধ করতে চায় কেন্দ্র ▯ তারক সাহা ▯ ১৭

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্ব বাংলা— সত্যের সন্ধানে ▯ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ▯ ১৯

বিশ্ব বাংলার মালিকানা কার, জানার অধিকার রয়েছে জনসাধারণের ▯ দেবাংশু ঘোড়ই ▯ ২১

খড়ের কাঠামো বেরিয়ে পড়বে না তো? ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২২

মুড়ির চেয়ে বড় রেটিং আগামী মাসে গুজরাট ও হিমাচল থেকে আসবে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

গ্রামবাংলাকে মুখরিত করে তোলে নবান্ন উৎসব ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

মহাগ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

কলকাতার রাস্তায় নরপশুদের উল্লাস ▯ বেদমোহন ঘোষ ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** ▯ **অন্যরকম : ৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও পরম্পরা

ত্রিপুরার ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিংবদন্তী এই, রাজা যযাতি থেকে ত্রিপুরার রাজবংশ শুরু, যা আজও প্রবহমাণ। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ত্রিপুরা আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তারই একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত এই সংখ্যার আলোচ্য। ভারতের পূর্ব প্রান্তের এই ছোট রাজ্যটি শুধু পর্যটকদের আকর্ষণের ক্ষেত্রই নয়, ভারত ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও ত্রিপুরার এক বিশেষ স্থান রয়েছে। এইসব নিয়েই এবারের আলোচ্য ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও পরম্পরা।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

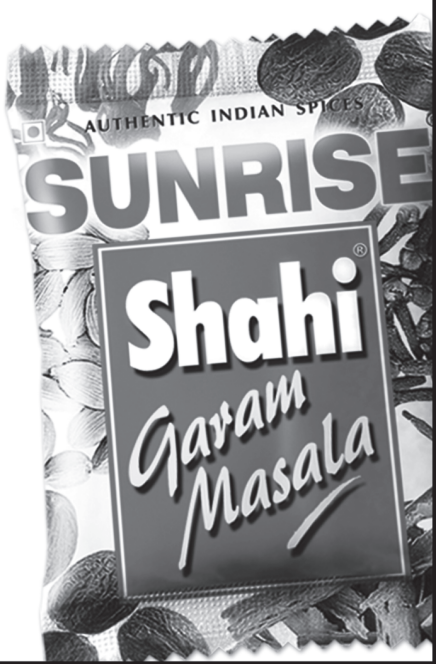

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ভারত আজ এক উদীয়মান শক্তি

পুরাতন বিশ্ব ব্যবস্থার বদলে কি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে? গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর ছড়ি ঘোরাইতে অভ্যস্ত ছিল তাহাদের সেই ক্ষমতার দম্ভের দিন কি এখন শেষ? সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপতি নির্বাচন লইয়া যেসব ঘটনা ঘটিল, তাহা কি এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে না? এই বিচারপতি নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকায় ছিল পুরাতন বিশ্ব শক্তির প্রতিভূ ব্রিটেন এবং বর্তমান বিশ্বে উদীয়মান শক্তি হিসাবে পরিচিত ভারত। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকে পিছাইতে হইয়াছে, তাহাদের প্রার্থী ক্রিস্টোফার গ্রিনবুডের নাম প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের প্রার্থী বিচারপতি দলবীর ভাণ্ডারী আগামী নয় বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আইনি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক আদালতই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই আদালতের প্রতিষ্ঠা এবং ১৫ জন বিচারপতি এই আদালতের বিচারকের পদ অলংকৃত করিয়া থাকেন। বস্তুত এই আদালতের বিচারপতির পদটি যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দলবীর ভাণ্ডারীর পক্ষে মতদান করিলেও নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য—ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন তাহা স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত—এই সত্যটি যখন বুঝিল, তখন নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করা ব্যতীত আর কোনও পথ ছিল না। এইরকম এক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া দলবীর ভাণ্ডারী জয়ী হইয়াছেন যাহা একই সঙ্গে আনন্দের এবং গৌরবের। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৮৩টি দেশের তিনি সমর্থন লাভ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি দেশেরও (ভেটো দেবার ক্ষমতাস্বরূপ ওই পাঁচটি রাষ্ট্র-সহ) সমর্থন লাভ করিয়াছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই জয়ের জন্য দলবীর ভাণ্ডারীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ দলবীরের এই জয়কে বিদেশ মন্ত্রকের পুরো 'টিম'-এর প্রচেষ্টার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরউদ্দিনও এই জয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের ৭১ বৎসরের ইতিহাসে এই প্রথম ব্রিটেনের কোনও প্রতিনিধির স্থান হইল না। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, এই প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের প্রার্থী অস্থায়ী সদস্যদের এক প্রার্থীর কাছে পরাজিত হইলেন। এই ফলাফল বিশ্বে ব্রিটেনের ভাবমূর্তিকে ম্লান করিবে। অন্যদিকে এই জয়ের কৃতিত্ব ভারতের সূক্ষ্ম ও আক্রমণাত্মক কূটনীতির প্রাপ্য। ডোকলাম, চীনকে সন্ত্রাসবাদের জন্য পাকিস্তানের নিন্দা—ভারতের কূটনীতির বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম—বিশ্ব আজ তাহা বুঝিতেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত আজ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিবার ক্ষমতা ভারত আজ রাখে। ১৯৬২-র ভারত আর ২০১৭-র ভারত এক নহে। বিশ্বে ভারত আজ এক উদীয়মান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত—ইহাকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুভাষিতম্

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিণী।

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।। (চাণক্য শ্লোক)

যার গৃহে মা নেই এবং স্ত্রী প্রিয়ভাষিণী নয়, তার বনে চলে যাওয়া উচিত। কেননা তার কাছে ঘর এবং বন দুটিই সমান।

রেলের কোপে শতবর্ষ প্রাচীন বালাজী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শালিমারে রেলের সম্প্রসারণের কাজের জন্য প্রায় একশো বছরের পুরনো একটি বালাজী ও রামমন্দির ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। শনিবার ২৫ নভেম্বর পূজা-পাঠ-প্রার্থনা ও কার্যত করসেবার মাধ্যমে ওই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। মন্দিরের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে স্তম্ভ নির্মাণের জন্য রেলের খোঁড়া কয়েকটি বিশাল গর্তও সমবেত জনতা মাটি ফেলে বুঁজিয়ে দেয়। বহু মহিলাও একাজে হাত লাগান। সকলের কণ্ঠে ছিল মন্দিরকে যথাস্থানে রেখে দেওয়ার দাবি।

মন্দিরের পরিচালক শালিমার অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আর কালিদাস জানান, মন্দিরটি রেলের জমির উপর অবস্থিত। কিন্তু গত শতকের গোড়ার দিকে রেলে ও স্থানীয় ছোট-বড় শিল্পে কাজ করার উদ্দেশ্যে শালিমার অঞ্চলে আসা তেলুগুভাষী বিপুল সংখ্যক মানুষের পূজার্চনার জন্য ব্রিটিশ রেল প্রশাসনের অনুমতিতে ১৯২২ সালে মন্দিরটি নির্মিত হয় এবং বালাজী বেঙ্কটেশ্বর ও রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত

মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করেছেন। এসেছেন রেলের বহু কর্তাব্যক্তি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীরা। সেই মন্দির এখন ভেঙে দেওয়ার আদেশ নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। কালিদাস দৃষ্টান্ত দেন, কাছেই সাঁতরাগাছি স্টেশনে ৫ ও ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে ব্রহ্মবাবার একটি মন্দির অক্ষত রেখেই রেলের নির্মাণ কাজ হয়েছে। দেশের বহু জায়গায় এরকম নিদর্শন রয়েছে। তাই শালিমারের মন্দিরটি যথাস্থানে অক্ষত রাখতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় সামান্য হেরফের করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি। নইলে আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের দিনই খড়্গপুরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এডিআরএম মনোরঞ্জন প্রধান সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, মূল মন্দির অবিকৃত রেখেই রেলের উন্নয়নের কাজ হবে। অযথা কিছু মানুষ এনিয়ে মিথ্যা প্রচার করছেন। রেল নিজের কাজ চালিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কালিদাস বলেন, এডিআইএম সাংবাদিকদের যা বলছেন, তা যদি তিনি লিখিতভাবে জানান তাহলে আমরা আর আন্দোলনে যাব না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রেলের যে চিঠি আমাদের হাতে আছে, তাতে অবিলম্বে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে, মন্দির ভেঙে ফেলার আদেশ আছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। এদিনের আন্দোলনে হিন্দুদের কয়েকটি সংগঠনও সহযোগী ছিল।

ভারতের চলচ্চিত্র সেনসর বোর্ড সত্যিই কি খুব ভয়ঙ্কর না নিতান্তই নির্বিষ সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পদ্মাবতী ছায়াছবি নিয়ে দেশব্যাপী যে টানাপোড়েন চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেনসর বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দানা পাকাচ্ছে। দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনে একটি সুষ্ঠু ধারা বজায় রাখতে ১৯৫২ সালে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ছবি প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেতে গেলে কতকগুলি নিয়ম সম্বলিত **Cinematograph Act**-এর প্রচলন হয়। চলতি সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর ছবির বিষয়বস্তু বা ট্রিটমেন্ট কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সেই নিরিখেই ছবিটি পরীক্ষিত হয়। অবশ্যই আইনটিতে শিল্পীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ যাতে অনাবশ্যকভাবে ব্যাহত না হয় সেকথাও উল্লেখিত আছে। চূড়ান্ত হিংসা, মাদক চোরাচালান, নেশার বস্তুর অত্যধিক প্রদর্শন, অপরাধ ঘটানোর কলা কৌশল বা নারীর ওপর যৌন নির্যাতন বা এমন কিছু যা সমাজের সংবেদনশীলতার ওপর আঘাত হানতে পারে এমন কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও সংহতি নষ্ট করতে পারে এমন বিষয়কেও চলচ্চিত্র-আইন কখনই মান্যতা দেয় না। এছাড়া আরও কিছু বিধিনিষেধ আছে। আজকের ভারতে বিশ্বের সর্বাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। ২০১৬-১৭ সালে, সংখ্যাটি ১৯৮৬। এটি আমেরিকার হলিউড প্রোডাকশনের দ্বিগুণ সংখ্যা। ভারতই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিল্ম বাজার। বাজারে চলতি বিতর্কের সূত্রে কীভাবে ছবি সেনসর হচ্ছে তা নিয়ে খুবই কৌতূহল দেখা দিচ্ছে। প্রথমেই ছবির নির্মাতারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বা যারা সেনসর করার অধিকারী সেই দপ্তরে (সিবিএফসি) ছবির ভিডিও জমা দেয়। ছবিটি ২ জন মহিলা সমেত চার সদস্যের নিরীক্ষক দল দেখেন। প্রত্যেক সদস্য তাঁদের রিপোর্টে কোনো অংশে কাট বা সংলাপে সাইলেন্ট করে দেওয়া ইত্যাদি যদি প্রয়োজন মনে করেন সেগুলি চেয়ার পার্সনের কাছে দেন। ইনি সরকারি প্রতিনিধি। তিনি সদস্যদের মত অনুমোদন করতে পারেন, না হলে রিভাইজিং কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন। এঁদের সাজেশন যদি থাকে এবং সেগুলিও যদি প্রযোজক মানতে না চান সেক্ষেত্রে তিনি **Film Certification Appellate Tribunal**-যেতে পারেন। ঠিক আদালতের মতই এর বিন্যাস। এখানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, **U** অর্থাৎ অবাধ প্রদর্শনের ছবিতেও কাট দেওয়া হয়। চার ধরনের বিভাগ রয়েছে **U, UA, A** ও **S**। **S** অর্থাৎ ডাক্তার বা বিজ্ঞানী বা নির্দিষ্ট পেশাদারদের জন্য তৈরি কোনো ছবি। সুতরাং চলচ্চিত্র সেনসরশিপ কোনো ঐচ্ছিক বা তুঘলকি ব্যাপার নয়। দেশের প্রচলিত আইনের পরিধি ও শিল্পীর স্বাধীনতাকে মান্যতা দিয়েই সেনসর বোর্ড কাজ করে।

অযোধ্যায় রামমন্দির ছাড়া অন্য কিছু নয় : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরমশ্রদ্ধেয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহন ভাগবত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অযোধ্যায় রামমন্দির ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা যাবে না। কর্ণাটকের উদুপিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত তিন দিনের ধর্মসংসদে সারাদেশ থেকে আসা সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে একথা ঘোষণা করেন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, 'রামজন্মভূমিতে শুধু রামমন্দিরই তৈরি হবে। অন্য কিছু নয়। প্রাচীন মন্দির যেরকম ছিল নতুন মন্দির হবে সেই আকৃতির। তৈরি হবে সেই একই পাথরে এবং কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে যারা রামমন্দিরের জন্য লড়াই করে আসছেন, নতুন মন্দির তৈরি করবেন তারাই। এটা কোনও জনমোহিনী ঘোষণা নয়। এটা আমাদের সকলের মনের কথা এবং এমন এক সত্য যা পরিবর্তন করা অসম্ভব।' তিনি আরও বলেন, রামমন্দির তৈরি হওয়ার মুহূর্তটি যত কাছে এগিয়ে আসছে আমাদের সকলের দায়িত্ব তত বেড়ে যাচ্ছে। কারণ এটাই সেই মুহূর্ত যার জন্য আমরা সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

রামমন্দির নিয়ে সারা দেশ জুড়ে একেরপর এক উত্থান পতনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'যখন কেউ রামমন্দির নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি তাকে স্পষ্ট কোনও জবাব দিই না। কারণ আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারি না। ১৯৯০ সালে বালাসাহেব (সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস) একবার আমাকে বলেছিলেন, রামমন্দির তৈরি করতে ২০ থেকে ৩০ বছর সময় লাগবে। ২০১০-এ ২০ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২০ সালে ৩০ বছর সম্পূর্ণ হবে। রামমন্দিরের নির্মাণ নিয়ে দেশজুড়ে মানুষের বিপুল উদ্যম ব্যর্থ হয়নি। সাফল্যের মুহূর্তটি খুবই কাছে এসে পড়েছে। তবে আমাদের এখনও সদর্থক পদক্ষেপ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু ধর্মের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ খুবই জরুরি। এছাড়া অন্য কিছু ভাবতে আমরা রাজি নই। আমরা লক্ষ্যের অনেক কাছে চলে এসেছি। কিন্তু ইংরেজিতে একটা কথা আছে, কাপ আর ঠোঁটের মাঝে সবসময়েই একটা ফাঁক থাকে। তাই কোথাও কোনওরকম গাফিলতি চলবে না।'

সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বলেন, 'মানুষের ভুল তখনই হয় যখন সে ভাবে ভুল করলে কোনও সমস্যা হবে না।' এই সঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা, 'এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে অন্য লোকের ক্ষতি হয়। সকলের মঙ্গলই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেউ যেন তার আত্মপরিচয় না হারায়। অযোধ্যায় যে রামমন্দির হবে তা দেখে সবাই যেন আনন্দ পায়। তবেই আমাদের জয় হবে। আমি সেই জয় হাতের মুঠোয় দেখতে পাচ্ছি।'

উদুপির পেজাওয়ার মঠের বিশ্বেসতীর্থ স্বামীজী বলেন এক বছরের মধ্যে অযোধ্যায় রামমন্দিরের নির্মাণ শুরু হবে। তাঁর কথায়, 'মন্দির নির্মাণের পরিবেশ এখন অনুকূল। ২০১৯-র মধ্যে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে।' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্ট (কার্যকরী) প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেন, 'আমরা অযোধ্যায় রামমন্দির চাই এবং ভারতে রামরাজ্য।' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আর এক শীর্ষস্থানীয় নেতা সুরেন্দ্র জৈন বলেন, 'আগামী বছরের ১৮ অক্টোবর থেকে রামমন্দির গড়ার কাজ শুরু হবে। আর পরের ধর্মসংসদ অযোধ্যাতেই বসবে।':

গুজরাটের ভোটযুদ্ধ আসলে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাহুল গান্ধীর কুরুচিকর আক্রমণের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের জেল-মুক্তির খবর পেয়েই কদর্যভাষায় করা এক ট্যুইটে রাহুল মোদীর 'আলিঙ্গন নীতি'কে কটাক্ষ করেন। গুজরাটে ভোটের প্রচারে গিয়ে মোদী স্মরণ করিয়ে দেন এই বছরেই ডোকলামে যখন চীনা সেনাবাহিনীর চোখে চোখ রেখে ভারতীয় সেনা দাঁড়িয়েছিল তখন রাহুলের উষ্ণ আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছিলেন চীনা রাষ্ট্রদূত। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন যে গণতান্ত্রিক উন্নয়ন বনাম রাজতন্ত্রের লড়াই চলছে গুজরাটে।

রাজনৈতিক মহল মনে করেন ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া রাহুল ক্রমাগত দেশবিরোধী কার্যকলাপে মদত দিয়ে গিয়েছেন। এবং এ কাজে তার সঙ্গী হিসেবে জুটেছে আজন্ম দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা। আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন থেকে শুরু করে চীনের সঙ্গে সমঝোতা রাহুলের ভারত বিরোধিতার মুকুটে এমনই অজস্র পালক। বিশেষজ্ঞরা গুজরাট নির্বাচনেও রাহুল আর তার দলবলের জাত-পাতের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনে যাওয়াতে দেশের সংহতিতে চিড় খাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর ওপরই আস্থা রাখছেন গুজরাটবাসী তথা দেশবাসী।

গুজরাট নির্বাচনের প্রাক্-সমীক্ষাতেও বিজেপির পক্ষে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ের ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও রাহুলের নেতৃত্বে দেশদ্রোহীরা নানা অপপ্রচার ও কুকর্মের মাধ্যমে মোড় ঘোরাতে মরিয়া। যদিও তাদের সামনে মূল বাধা খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই। যাকে একদা 'মওত কা সওদাগর' (মৃত্যুর সওদাগর) বলে গুজরাট থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কংগ্রেস, এবার সেই পথেই কংগ্রেস মুক্তির যোলকলা পূর্ণ হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

পাদরি তোপ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ভোট না দেওয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের রাজধানী শহর গান্ধীনগরের নির্বাচনী অফিসার তথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সতীশ প্যাটেল শহরের মুখ্য খ্রিস্টান পাদরিকে জরুরি ভিত্তিতে একটি কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠালেন। গুজরাট নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই আর্চবিশপ বিভিন্ন মিডিয়াকে ডেকে তাঁর মত ব্যক্ত করে জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশকে জাতীয়তাবাদী শক্তির হাত থেকে বাঁচান'। সংবাদ সংস্থাগুলিতে পাদরি টমাস ম্যাকওয়ানের বিতর্কিত সতর্কবাণীর ভিত্তিতে শ্রী প্যাটেল ওই পাদরিকে কেন তিনি এমন বক্তব্য রেখেছেন তার জবাব চেয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিশদে জানতে চাওয়া হয়েছে। আহমেদাবাদ অঞ্চলে এই সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার পর জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তাঁকে যথাযথ জবাবদিহি করার জন্য চিঠিতে

পাদরি টমাস ম্যাকওয়ান

কয়েকদিন সময় দিয়েছেন। উত্তর পাওয়ার পর যে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে তারও ইঙ্গিত চিঠিতে আছে।

তাঁর (আধিকারিকের) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই পাদরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত করার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার মত ব্যক্ত করেছেন। রাজ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকা অবস্থাতেই পাদরি এই কাজ করেছেন। বক্তব্যের ভাষা নিয়েও নির্বাচনী আধিকারিক তাঁর আপত্তি ব্যক্ত করেছেন।

সংবাদ সংস্থাকে ওই পাদরি বলেছেন, কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিই যেন নির্বাচিত হন যাঁরা ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে প্রতিটি মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান করবে ও কোনো বৈষম্য করবে না। তিনি শুধু তাদেরই জন্য প্রার্থনা করার ডাক দেন। অন্য পাদরিদের দেওয়া নির্দেশে ওই আর্চবিশপ জানান, 'জাতীয়তাবাদী শক্তি যে কোনো মুহূর্তে দেশকে কবজায় নিয়ে নেবে। কিন্তু গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনে তাদের বিপর্যয় ঘটাতে পারলেই কেবল এই ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।' হায়! দেশে এমন পাদরির চেয়ে সন্ত্রাসবাদী শ্রেয়, তাদের অন্তত শনাক্ত করা যায়।

পাক-পরমাণু অস্ত্র নিয়ে উদ্বেগ মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্কের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানের কৌশলগত নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কর্মসূচি শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাকেই বিপন্ন করবে না, একইসঙ্গে প্রথাগত যুদ্ধকেও নিউক্লিয়ার স্তরে পৌঁছে দেবে। এমনই উদ্বেগ প্রকাশ করল একটি মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্ক। আটলান্টিক কাউন্সিল নামের ওই থিঙ্কট্যাঙ্কটি 'দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার যুগে এশিয়া' শিরোনামে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এর উল্লেখ রয়েছে। যদিও রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে যে পাকিস্তান তাদের কৌশলগত নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিকল্পনা এখনও কার্যকর করেনি। কিন্তু এই রিপোর্টেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কূটনীতিবিদরা। তাঁদের বক্তব্য, পাকিস্তানের কার্যকলাপ চিরদিনই ভারত-বিরোধী। কিন্তু বর্তমানে কড়া ভারতীয় প্রশাসনের মোকাবিলায় প্রায়ই পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্ব ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিয়ে থাকেন। কিছুকাল আগেই পাকিস্তানের এক শীর্ষকর্তা বলেছিলেন যে তাদের হাতে থাকা পরমাণু বোমা কেবল সুরক্ষিতই নেই, এমন গোপনীয় জায়গায় আছে যে তা উদ্ধার করা বা জানা কোনো বৈদেশিক শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

যদিও সমর বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেহেতু পাক প্রশাসন জঙ্গি নিয়ন্ত্রিত পাক সেনাবাহিনী ও পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর কথায় ওঠে-বসে, তাই পাকিস্তানের হাতে থাকা পরমাণু বোমার হদিশ জঙ্গিদের ভালোই জানা আছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও পাকিস্তান এ ব্যাপারে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে চীনের মদতে। তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে একদিকে উত্তর কোরিয়া, অন্যদিকে পাকিস্তানকে দিয়ে আমেরিকা ও ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই চীনের কৌশল। তাই পাকিস্তানকে পরমাণু-নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য না করা গেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আতঙ্ক কাটবে না বলেই তাঁদের মত। রিপোর্টেও এই বিষয়টি ঘুরিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'বড়, আধুনিক ও পরিবর্তনীয়' নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের জন্যই যে কেবল ওই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে তা নয়, প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচের জন্যও তারা মদত পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যত স্থায়িত্ব 'ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি' (অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাবর্তন)-র মতোই অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। রিপোর্টে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে গত চার দশকে আফগানিস্থান ও ভারতে যে পরিমাণ জেহাদি হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে অনেক বেশি হামলা হয়েছে পাকিস্তানে। মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্কের ধারণা এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু যে সবসময়ই 'রাষ্ট্র' হিসাবে পাকিস্তান ছিল বা পাকিস্তানি জনগণকে তারা লক্ষ্য করেছিল তা নয়, পরমাণু অস্ত্র থাকতে পারে এমন স্পর্শকাতর সেনাবাহিনীর ঘাঁটিকেও তারা লক্ষ্য করেছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার অস্ত্র যে-কোনোদিন জঙ্গিদের হাতে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধের নিয়ম-রীতি মানার প্রশ্নই নেই। নীতিহীন যুদ্ধের ফলে এশিয়ার শান্তিই শুধু বিঘ্নিত হবে না, মহাদেশটিও ধ্বংসের মুখে চলে যাবে।

চা বিক্রি করতাম, দেশ বিক্রি করিনি : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের 'চাওয়ালা' অপমানের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আয়োজিত এক জনসমাবেশে তিনি বলেন, 'আমি একসময় গরিব ছিলাম, তাই কংগ্রেস আমাকে অপছন্দ করে। একটা রাজনৈতিক দল কতটা নীচে নামতে পারে এটা তার প্রমাণ। আমার মতো একজন গরিব মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, এটা ওরা সহ্য করতে পারে না।' এরপরেই তার গর্বিত স্বীকারোক্তি, 'হ্যাঁ আমি চা বিক্রি করতাম কিন্তু দেশকে কখনও বিক্রি করিনি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'সৌরাষ্ট্রের ভূমিপুত্র কেশুভাই প্যাটেল যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন তখন কংগ্রেস তাকে দিনের পর দিন হেনস্থা করেছে। একই অবস্থা হয়েছিল প্যাটেল সম্প্রদায়ের আনন্দীবেন প্যাটেলেরও। কংগ্রেস চিরকাল গুজরাটকে অপমান করেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনসঙ্ঘের সমর্থনে বাবুভাই প্যাটেল যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন তখনও কংগ্রেস সেই সরকারকে ফেলে দেবার সবরকম চেষ্টা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী গরিব মানুষকে এবং দরিদ্র পরিবার থেকে যেসব নেতা উঠে এসেছেন তাদের অপমান না করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন।

উবাচ

"২৬/১১ বা এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা মানবিক মূল্যবোধগুলিকেই বিনষ্ট করে। তাই শুধু ভারত নয়, সকল মানবতাবাদী শক্তিগুলিকেই সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাসবাদের ক্ষতিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মুম্বইতে ২৬/১১-তে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে

"আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং সিস্টেম সবার জন্য। ইসলামিক ব্যাঙ্ক চালু করার কোনও পরিকল্পনাই নেই।"

মুক্তার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী

মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে

"কতদিন সংসদ বসবে এটা কোনও বিষয় নয়। কতদিন সংসদে কাজকর্ম হবে সেটাই বিষয়।"

বেঙ্কাইয়া নাইডু
উপরাষ্ট্রপতি, ভারত

সংসদের অধিবেশন নিয়ে কংগ্রেসের কটাক্ষ প্রসঙ্গে

"পুলিশ এতদিন দলদাস ছিল। এখন ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল দলটা পুলিশের ওপর ভর করেই চলছে।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

খড়্গপুরে দলীয় সভায় বক্তব্যে

"গত আটমাসে এটা মোটামুটি বোঝা গেছে যে, লস্করের কম্যান্ডার যে হবে সে আর বেশিদিন বাঁচবে না।"

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

সন্ত্রাস দমনে ভারতের সাফল্য প্রসঙ্গে

গুজরাটে বিজেপি জিতছে, আসন সংখ্যা নিয়ে সংশয়

একটা কথা মানতেই হবে যে গুজরাটের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনীতিতে যতটা প্রভাব ফেলবে ততটা প্রভাব অন্য কোনো রাজ্যের নির্বাচনের নয়। সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকার সুবাদে দেখেছি নির্বাচনী প্রচার চলাকালে প্রতি সপ্তাহে ভোটদাতাদের মুড পাল্টাতে। কখনও শাসকদলের পাল্লা ভারী হয়। আবার কখনও বা বিরোধীদের। এখন গুজরাটে যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন পরে গুজরাটের ভোটের লড়াইতে প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গুজরাটে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ১৮০ আসনের বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা কত হবে তা নিয়ে বিতর্ক থাকবে। বিজেপির আশা এবং বিশ্বাস যে দলের প্রার্থীরা ১৫০টি আসনে জয়ী হবে। গত নির্বাচনে বিজেপির আসন ছিল ১১৬টি। প্রশ্নটা এখানেই। কিভাবে হবে তা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং গতবারের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের সময় যে পরিস্থিতি ছিল এবার তা নেই। বিজেপি বিরোধী শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী এবার।

পশ্চিমবঙ্গে বসে আবেগের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরে গুজরাটের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করাটা ভুল হবে। গুজরাটে মোদীজীর প্রভাবকে স্বীকার করেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ভোটের রাজনীতি বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। মোদীজী চার পাঁচ দিন গুজরাট সফর করে এক ডজন সভায় ভাষণ দিয়ে চলে গেলেই বিজেপির ভোটবাক্সে ঢল নামবে এমন হিসেব যাঁরা করেন আমি সে দলে নেই। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় একটি দল থাকলে প্রশাসন বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠে। গুজরাটে সেই মনোভাবই মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেখানে বিজেপি রাজের বিরুদ্ধে পাতিদার, ওবিসি, দলিতদের একটা বড় অংশ আজ কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখতে হবে যে গুজরাটের ভোটদাতাদের মধ্যে পাতিদারদের ভোটের ভাগ ১৪ শতাংশ। এর সঙ্গে দলিত ও ওবিসিদের সংখ্যা যোগ করলে হয় ৬০ শতাংশ। মোদীজী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন পাতিদার, দলিত এবং ওবিসিদের সমস্যাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতেন। নিম্নবর্গের মানুষের মনে সামাজিক

গূঢ় পুরুষের

কলম

ক্ষোভ ছিল না। পরবর্তীকালে যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী হন তাঁরা কেউই নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন না। তাঁরা তোষামুদে পারিষদ পরিবৃত হয়ে গান্ধীনগর থেকে গুজরাট শাসন করেছেন। রাজ্যের অনুন্নত নিম্নবর্গের মানুষের চাহিদা সম্পর্কে জানার বা বোঝার চেষ্টা করেননি। তাই পাতিদার নেতা হার্দিক পটেল, ওবিসি নেতা অল্পেশ ঠাকোর এবং দলিতদের নেতা জিগনেশ মেবানিরা বিজেপির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কংগ্রেস শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এই তিন যুবনেতাই তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান মুখ তাতে সন্দেহ নেই। এদেরই প্রভাবে গুরজাট কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাউন্সিলের ভোটে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের। অবশ্য একথাও মানতে হবে যে ছাত্র কাউন্সিলের ভোট আর বিধানসভার ভোট এক নয়। কাউন্সিলের ভোটের প্রভাব বিধানসভার ভোটে পড়বে না। তবে ভুললে চলবে না যে এর আগে বারাণসী, জে এন ইউ এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনেও বিদ্যার্থী পরিষদ খারাপ ফল করেছে। অর্থাৎ দেশের যুবসমাজের মধ্যে কিছু দাবি বা চাহিদা আছে যা তাঁরা পাচ্ছেন না।

বিজেপির রিপোর্ট বলছে, গুজরাটের রাজনীতিতে গ্রাম এবং শহরের রাজনীতিতে একটা স্পষ্ট ভেদ আছে। গত বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস যে ৬৪টি আসনে জিতেছিল তার মধ্যে ৬১টি আসন এসেছিল গ্রামের থেকে। আর আমেদাবাদ, ভদোদরা, সুরাট, রাজকোট, জামনগর, ভাবনগর পোরবন্দরের মতো বড় শহরে বিজেপি একতরফা জিতেছে। পরে ২০১৫ সালে গুজরাটের পুরসভার নির্বাচনে প্রায় সব শহরেই বিজেপি বোর্ড গঠন করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালের শেষ মাসে পরিস্থিতি এক নয়। এখন নোটবন্দি এবং জি এস টি শহরাঞ্চলের এক শ্রেণীর ভোটারকে বিরূপ করেছে। তাছাড়া হার্দিক পটেল যদি পাতিদার ভোট ভাগ করাতে পারেন এবং কংগ্রেসের দিকে ৪০ শতাংশ পাতিদার ভোট নিয়ে আসতে পারেন তা হলে সুরাট এবং রাজকোটে বিজেপির জয় সহজ হবে না। গুজরাট রাজ্য বিজেপি নেতারা অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে চান না। তাঁদের বক্তব্য, কেশুভাই পটেল পাতিদারদের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন। তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ২০১২ সালে মাত্র ৩.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। পাতিদাররা চিরকাল বিজেপির ভোটার। গুজরাটের ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ মেটাতে জিএসটি সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া তিন তালাক রোধ এবং হিন্দুত্ব এবার ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে গুজরাটের ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে কট্টর হিন্দু। সুতরাং তাঁদের ভোট যে কমলফুলেই পড়বে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবে ভোটের রাজনীতিতে বাস্তবকে উপেক্ষা করাটা বোকামি। আরও বোকামি হবে আসন সংখ্যা আগাম বলা। নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখাটা ঠিক নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া। গুজরাটে বিজেপির প্রয়োজন ৯১-৯২টি আসন। বাড়তি আসন পেলে তা হবে বোনাস পাওয়া। ■

এক স্বয়ংসেবকের মৃত্যু এবং

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

অনেক যন্ত্রণা নিয়ে এই চিঠি। মার্জনা করবেন।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতোই ছিল তাঁর অবস্থা। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় সব প্রতিকূলতার মধ্যেও, বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েও তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। শৈশব থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষার পরিবেশে তাঁর বড় হওয়া সেটাই তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত বড় করে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরেও। যে আততায়ীরা রাতের অন্ধকারে তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করেছে তাঁরাও অনেক আগেই হেরে গিয়েছিল। সেই হেরে যাওয়ার বদলা নিতে গিয়ে নতুন করে জিতিয়ে দিয়ে গেল মনোজ উপাধ্যায়কে।

স্বয়ংসেবক মনোজ উপাধ্যায়। হতে পারেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার প্রধান ছিলেন কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তিনি স্বয়ংসেবক। ভদ্রেশ্বর শহরের মানুষ তাঁকে যতদিন চেয়ারম্যান বা তৃমণূল কংগ্রেস নেতা হিসেবে দেখেছেন তার থেকে অনেক বেশিদিন দেখেছেন 'খাকি' হাফ প্যান্ট পরা ববস্থায়। দেখেছেন শাখার মুখ্যশিক্ষক থেকে মহাকুমা স্তরের দায়িত্ব সামলানো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা হিসেবে। ভদ্রেশ্বর দেখেছে সঙ্ঘের ঘোষ-বাহিনীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মনোজ উপাধ্যায়। তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ সম্পন্ন করা মনোজ উপাধ্যায়কে। কিন্তু কেন এমন একজন সঙ্ঘ-অন্ত প্রাণ মনোজ তৃণমূলে যোগ দিলেন? এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে কারও মনে। আর সে এক বিরাট কাহিনি। সিপিএমের তোষণ রাজনীতি, মনোজের জেলবাস সেসব অনেক পর্ব। আর তার পরে বেঁচে থাকার আশায় নয়, মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদেই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রয় নেন মনোজ। তাই তো তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে এক ঘণ্টার জন্য হলেও সব দলকে মিলিয়ে দিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া এক তরতাজা যুবক খুনের মূল চক্রীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ভদ্রেশ্বর থানার সামনে গর্জে ওঠে হাজার হাজার মানুষ। দলীয় পতাকা ছাড়াই। সেই ভিড়ে তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস সব দলের সমর্থকেরাই ছিলেন।

কী করেছিলেন মনোজ? কেন তাঁর মৃত্যুর পরে এত বিক্ষোভ? এক কথায় বলতে গেলে একজন 'রাজনীতিকে'র যা নীতি থাকা উচিত তাই করেছেন মনোজ। দেশপ্রেম যে কাজের তাগিদ। মনোজ থাকলে যে নির্মাণ প্রকল্পে সুবিধা পেতে এলাকার কেউকেটাদের 'নজরানা' দিতে হয় না কোনও প্রোমোটারকে। বলে দিয়েছিলেন--- 'ভদ্রেশ্বরে এসব চলবে না। ই-টেন্ডারে সব কাজ হবে।' এই রাজ্যে ভদ্রেশ্বর হয়ে উঠেছিল এমন এক শহর যে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সিন্ডিকেট নেই। তৃণমূল নেতারা কেউ টাকার বিনিময়ে রাস্তায় হকার বসাতে পারতেন না। পুরসভার কোনও পরিষেবা পেতে কোনও ফাঁদ ছিল না। সবেতেই নজর ছিল স্বয়ংসেবক মনোজের।

পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ না-হওয়ায় তেলেনিপাড়ায় অস্থায়ী জেটি তৈরিতে রাজি হননি তিনি। যা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জেলা পরিষদের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। পুরসভা পরিচালিত অঙ্কুর হাসপাতালের যে উন্নয়ন তিনি ঘটিয়েছেন তাতে গরিবের যেমন দিন ফিরেছে তেমনই ঘুম ছুটে যায় অনেক নার্সিংহোম-মালিকের।

এবার চেয়েছিলেন রাস্তা দখল করে থাকা খাটাল উচ্ছেদ হোক। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ হলো না। সে কারণেই কি প্রাণ দিতে হলো মনোজকে? কে জানে! আসলে অনেক মৌচাকেই তিনি ঢিল মেরেছেন। আর তা থেকে অনেক চেষ্টাতেও তাঁর দল তাঁকে আটকাতে পারেনি। কার্যত মনোজের এলাকায় জেলা বা রাজ্যের বাকি নেতাদের কথা সেভাবে চলত না। স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদরাও জানতেন ওঁকে নীতি থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না। আবার স্বাধীন ভাবে ওঁকে কাজ করতে না দিলে ভোটে জেতাও যাবে না। সমাজের সব ক্ষেত্রেই স্বয়ংসেবকদের সফল ভাবে কাজ করার অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু একেবারে বিপক্ষের ঘরে বসে মনেপ্রাণে সঙ্ঘ-শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার এমন নজির খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, মনোজের খুনি ধরা পড়বে কিনা জানি না। কিন্তু একটা বিষয় জানি মনোজের উদাহরণ থেকে যাবে কারও কারও মনে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন প্রকৃত স্বয়ংসেবক কত প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে যেতে পারে দেখিয়ে গেলেন ৪৩-এর যুবক। আসলে ভালোবাসার উল্টো দিকটায় অনেক ঘেন্না থাকে। আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার।

—সুন্দর মৌলিক

মোদ্দা কথা বক্স অফিস, তার জন্য যে-কোনও কুকর্ম করা যায়

সন্দীপ চক্রবর্তী

পাঠক বলুন তো, কত জি.বি বুদ্ধি থাকলে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়? জানেন না তো, সঞ্জয় লীলা বনসালিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি অনায়াসে বলে দেবেন। কিংবা, একদা সফল অধুনা রাজনীতির গলিঘুঁজিতে দাঁড়িয়ে মুরুব্বি ধরার ফাঁদ পাততে ব্যস্ত এরকম যে কোনও অভিনেতা, পরিচালক, লেখক, শিল্পী, গায়ককে জিজ্ঞাসা করুন, তারাও বলে দিতে পারবেন।

আসলে এটা একটা ধাঁধা। চাষি, কামার, ছুতোর, চাকুরে, ব্যবসায়ী সবাইকে চেনা যায় কিন্তু বুদ্ধিজীবীকে চেনা যায় না। ঠিক যেমন সঞ্জয় লীলা বনসালিকে এখন চেনা যাচ্ছে না। তিনি কী চান! পালা শুরু হবার আগেই পাঁচ সিকের গাওনা গেয়ে মেঠো দর্শককে টানতে চান নাকি ইতিহাস বিকৃত করে বিতর্ক উসকে দিয়ে সেই আগুনে গা সেঁকতে চান। তিনি চিতোরগড়ের রানি পদ্মাবতীকে নিয়ে একটি ছবি তৈরি করেছেন। ছবির শুটিং চলাকালীনই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি বিষয়। আলাউদ্দিন খিলজির একটি স্বপ্নদৃশ্য এবং পদ্মাবতী রূপী দীপিকা পাড়ুকোনের একটি নাচ। স্বপ্নদৃশ্য এমন একটি খুড়োর কল যেখানে স্রেফ স্বপ্নের দোহাই দিয়ে শালীনতাকে উপেক্ষা করা যায়। বলিউডের পরিচালকেরা এ ব্যাপারে কতটা প্রতিভাবান তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এক্ষেত্রে সুবিধে হলো সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন আলাউদ্দিন খিলজি— যার বিকৃতকামের অজস্র উদাহরণ তখনকার ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুতরাং যদি শালীনতা একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ও পণ্যমনস্ক বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এরপরে আসছে নাচের প্রসঙ্গটি। স্বামী এবং শাশুড়ির মনোরঞ্জনের জন্য দাসী ও সখী পরিবৃত হয়ে পদ্মাবতীর একটি নাচের (সঙ্গে গান : 'ঘুমর ঘুমর...') দৃশ্য আছে ছবিতে। চিতোরগড়ের রাজপরিবারের অভিযোগ, রানির পক্ষে এভাবে নাচা সম্ভব নয়। দৃশ্যটি অতিরঞ্জিত এবং অবমাননাকর। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন কমল হাসান, শাহরুখ, সলমন, আমির-সহ বেশ কয়েকজন। বক্স অফিসের রাবড়ি সবাই খেতে চায়, তাই ওদের কথায় অবাক হয়ে লাভ নেই। কিন্তু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ওরা কি এমন কোনও মহিলাকে চেনেন যিনি দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ফেরা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নাচগান করেন? সাধারণ মহিলারা যা করার কথা ভাবতে পারেন না তা একজন রানি কীভাবে করতে পারেন? দাসীদের সঙ্গে নাচলে তার রানিত্ব আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? সঞ্জয় লীলা বনসালি জানিয়েছেন ছবিতে কোনও আপত্তিকর দৃশ্য নেই। ভালো কথা। তাহলে চিতোরগড়ের রাজপরিবার যখন অভিযোগ করল যে, তাদের যে চিত্রনাট্য দেখানো হয়েছিল ছবি সেই অনুযায়ী হয়নি, বাড়তি দৃশ্য যোগ করা হয়েছে, সঙ্গতকারণেই তারা নতুন চিত্রনাট্য দেখতে চাইলেন— কিন্তু দেখানো হলো না। বলা হলো, ছবির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ আপনি মেনে নিলেন যে অভিযোগ সত্যি। এমনকী, এও বলে দিলেন সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা সহমত হয়ে জানিয়েছেন, ছবিতে কোনও আপত্তিকর দৃশ্য নেই। পরে প্রসূন যোশী সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। তারা সহমত হওয়া তো দূর, ছবিটা তখনও দেখেনইনি। প্রশ্ন হলো, এই লুকোচুরি কেন বনসালিসাহেব? কী লুকোতে চাইছেন আপনি?

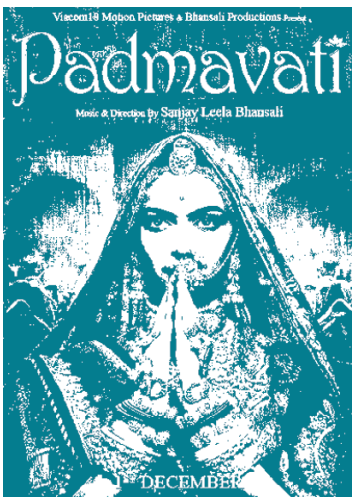

পদ্মাবতী কাল্পনিক চরিত্র— এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। পদ্মাবতী ঐতিহাসিক চরিত্র, ভারতীয় মহিলাদের আব্রুর প্রতীক— এইসব কথা মাথায় রেখেই তো বক্স অফিসের অঙ্ক কষা। এখন চরিত্রটি হঠাৎ কাল্পনিক হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে।

সঞ্জয় লীলা বনসালি এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এই পরিচালক বিতর্ক ভালোবাসেন। বিতর্কই তার ক্ষমতার উৎস। স্মরণ করুন 'হাম দিল দে চুকে সনম' (অজয় দেবগন, সলমান খান, ঐশ্বর্যা রাই অভিনীত) ছবিটির কথা। পুরোটা না হলেও এই ছবির

অনেকটাই মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'ন হন্যতে'-র টুকলি। অথচ ছবির টাইটেলে মৈত্রেয়ী দেবীর নাম নেই। সামান্য একটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত নয়। সেই সময় এই নিয়ে মৃদু বিতর্কের আঁচ তৈরি হয়েছিল। মৃদু কারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই সামান্য ব্যাপারে বড়ো একটা মাথা ঘামাননি। চলতা হ্যায় গোছের মানসিকতায় মেনে নিয়েছিলেন বরেণ্য লেখিকার অপমান। আর টলিউডের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এখনকার টলিউড তারকারা হিন্দি ছবিতে একটা পনেরো মিনিটের ফুটেজের জন্য যে কোনও অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে পারেন। তাই বনসালিকে চটানো যে কাজের কথা নয় সেটা বুঝতে ওদের দেরি হয়নি।

এরপর ব্ল্যাক (অমিতাভ বচ্চন রানি মুখার্জি অভিনীত)। ব্ল্যাক ছবিটি হেলেন কেলারের জীবনী অবলম্বনে তৈরি। হেলেন কেলারের জীবনকে কেন্দ্র করে হলিউডে একটি ছবি হয়েছিল। সিডনি শেলডন তার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। বনসালির ব্ল্যাক হলিউডের ছবিটির শট বাই শট টুকলি। অথচ বনসালিসাহেব তার ছবির কোথাও এই তথ্যের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কিন্তু তিনি উল্লেখ না করলেও কথাটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু ততদিনে বিতর্কের মইয়ে চেপে বক্স অফিসের মহাসমুদ্র পেরিয়ে গেছেন বনসালি।

পাঠক স্মরণ করুন দেবদাসের কথা। পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে নাচছে— এই দৃশ্য দেখলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বোধহয় ভিরমি খেতেন। কারণ পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালোবাসলেও, দুজনের প্রেমের চরিত্র আলাদা। একজন জমিদার- গৃহিণী অন্যজন বাঈজী। শুধু বিশ শতকের প্রারম্ভে (যে সময়ে দেবদাস লেখা হয়েছিল) কেন, এই একুশ শতকেও দুই মেরুর বাসিন্দা এরকম দুটি চরিত্রের পক্ষে একসঙ্গে নাচা সম্ভব নয়। নীতা অম্বানির পক্ষে কি সম্ভব কোনও অখ্যাত বারড্যান্সারের সঙ্গে নাচা? অথচ এই নাচটিই ছিল দেবদাস ছবির নিউক্লিয়াস। মাধুরী দীক্ষিত আর ঐশ্বর্যা রাইয়ের নাচ কি ছাড়া যায়? সে তাঁরা যতই চন্দ্রমুখী আর পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করুন। কী দরকার সাহিত্যিক সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার! বিশেষ করে যে লেখকের কপিরাইট চলে গেছে তার রচনা নিয়ে যথেচ্ছাচার করলে বলার তো কেউ নেই। দৈবাৎ যদি কেউ হৈচৈ করে তাহলে বাকস্বাধীনতার ধুয়ো তো রইলই।

বনসালির ঐতিহাসিক সিরিজেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বাজিরাও মাস্তানিতে মাস্তানি একজন নর্তকী। কাশীবাঈ বাজিরাওয়ের স্ত্রী। অথচ ছবিতে দুজনকে একসঙ্গে নাচতে দেখা গেছে। এটা নেহাতই বনসালির বক্স অফিসকে ঘায়েল করার ফর্মুলা। আপাতদৃষ্টিতে যে সমীকরণ অসম্ভব তাকেই একটা নাচগানের প্যাকেজে মুড়ে বাজারে ছেড়ে দাও, পাবলিক চেটেপুটে খাবে! তাতে যদি ইতিহাস বিকৃত হয় কিংবা মানুষের আবেগ দলিত হয়, বয়েই গেল। সুতরাং পদ্মাবতী ছবিতে রাজপুতরানি যে দাসী এবং সখী পরিবৃত হয়ে নাচবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটেছে। পদ্মাবতীর অনৈতিহাসিক চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে সারা দেশ যখন বিক্ষোভে শামিল, ঠিক সেই সময় বাঙালি ইতিহাসবিদ আদিত্য মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন পদ্মাবতী নাকি ঐতিহাসিক কোনও চরিত্র নয়। কারণ আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে ভারতে আসা আমির খসরু পদ্মাবতীর কথা কোথাও লেখেননি। এই নিবন্ধে পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

একথা ঠিক যে পদ্মাবতীর সময়ে রাজবংশের তথ্য সংরক্ষণের রীতি রাজপুতদের মধ্যে ছিল না। পদ্মাবতীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জইস লিখিত পদ্মাবত নামের একটি কবিতায়। সেখানে তিনি সর্দার রতন সিংহ (চিতোরের মহারানা) এবং রানি পদ্মাবতীকে নায়ক নায়িকা রূপে উপস্থাপিত করেছেন। জইস নিজে মুসলমান হলেও আলাউদ্দিন খিলজি তার কাছে খলনায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্নেল জেমস টডের লেখাতেও পদ্মাবতীর উল্লেখ রয়েছে।

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকালে সব থেকে বেশি জহরব্রত সংঘটিত হয়েছিল ভারতে। এর থেকে একটা কথা বলা যেতে পারে আলাউদ্দিন খিলজি নিজে এবং তার সৈন্যরা মেয়েদের ওপর অত্যাচারে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিল। চিতোর দুর্গের গাইড এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দু'পক্ষেরই মত, মোট তিনটে জহরব্রত দুর্গে সংঘটিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটিতে অংশ নিয়েছিলেন রানি পদ্মাবতী। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই দুর্গের অন্য রাজপুতানিরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। গৌরীশংকর ওঝা লিখিত 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস' গ্রন্থেও আমরা রানি পদ্মাবতী এবং তাঁর জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জনের উল্লেখ পাই।

এছাড়া, সি.কে.এম ওয়াল্টারও তার অ্যাব্রিজড হিস্টরি অব রাজপুতানা গ্রন্থে আলাউদ্দিন খিলজির 'কতল চিতোরগড়' নামক সামরিক অভিযানের কথা লিখেছেন। যে অভিযানের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পদ্মাবতীকে চিতোর থেকে তুলে এনে দিল্লির হারেমে বন্দি করা। যে কারণে পদ্মাবতী জহরব্রতের মাধ্যমে আত্মাহুতি দেন। এখন প্রশ্ন হলো, আমির খসরু তাহলে কেন লিখলেন না? উত্তরটা খুবই সহজ। পদ্মাবতীর কথা লিখলে খিলজির কথাও লিখতে হতো। ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল তাতে। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং পদ্মাবতী কাল্পনিক চরিত্র— এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। তাছাড়া পদ্মাবতী ঐতিহাসিক চরিত্র, ভারতীয় মহিলাদের আব্রুর প্রতীক— এইসব কথা মাথায় রেখেই তো বক্স অফিসের অঙ্ক কষা হয়েছে। এখন চরিত্রটি হঠাৎ কাল্পনিক হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে। বনসালি কখনই সেটা চাইবেন না। কারণ বক্স অফিসের জন্য তিনি যে কোনও কুকর্ম করতে পারেন। ▮

গুজরাটবাসী বিজেপিকে ভোট দেবেন উন্নয়নের জন্য : বিজয় রূপানি

গুজরাটের বিগত নির্বাচনগুলিতে সৌরাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা হিসেবে বিজয় রূপানির সাফল্য বিপুল। এখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যের বিজেপির লক্ষ্য ১৮২টি আসনের মধ্যে ১৫০টি পাওয়া। এই লক্ষ্যপূরণের আগে ইংরেজি দৈনিক দ্য পাইওনিয়ারের মুখোমুখি বিজয় রূপানি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নয়ন দাভে। এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হলো।

□ আপনি এই ত্রিমূর্তি— হার্দিক পটেল, অল্পেশ ঠাকুর এবং জিগনেশ মেভানির ব্যাপারে খুব ভালো জানেন যে এরা রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেসকে খোলাখুলি সমর্থন করছে। এরপরেও কীভাবে আশা করছেন যে বিজেপি ১৫০-এর বেশি আসন পাবে?

● রাজ্যের মানুষ খুব ভালো করেই জানেন যে এই তিনজন কংগ্রেসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। অল্পেশ সরকারিভাবেই এখন কংগ্রেসে যোগদান করেছে যদিও জনগণের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে রাজনীতিতে আসবে না। ফলে এখন এটা মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে গুজরাটকে অস্থির করতে এদের আন্দোলনের পেছনে কংগ্রেসই ছিল। কংগ্রেস খুব নীচু মানের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে এবং জাতপাতের নাম করে সমাজকে বিভক্ত করতে চাইছে। কংগ্রেসের কোনও রাজনৈতিক বিষয় নেই বলেই এদের আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের এই ধরনের কাজে মানুষ খুশি নন। রাজ্যবাসী আন্দোলনের প্রকৃত কারণ জানতে চাইছেন। এই ত্রিমূর্তি আসলে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাঁদের গোষ্ঠীর জন্য নয়। এই পরিস্থিতিতে, ১৫০-এর বেশি আসনে বিজেপির জয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

□ পাতিদার আনামত আন্দোলন সমিতি (পি এ এ এস)-র নেতারা ক্রমাগত আপনাকে এবং আপনার দলকে দোষারোপ করছে, কারণ তারা মনে করে যে হার্দিক পটেলের যৌন ভিডিও তৈরির জন্য আপনারাই দায়ী। আপনার কী মত?

● এই ভিডিওর ব্যাপারে বিজেপির কোনো ভূমিকা নেই। যদি তাদের কাছে প্রমাণ থাকে, তবে তো তারা পুলিশে এফ আই আর দায়ের করতে পারে, আদালতেও যেতে পারে। ভিডিও ভাইরাল (সংক্রামক) হওয়ার চারদিন বাদে পি এ এ এস নেতারা বিজেপিকে দোষারোপ করতে শুরু করলেন শুধুমাত্র হার্দিকের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য। এটা প্রকৃত বিষয় থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

□ বিজেপির নির্বাচনী অ্যাজেন্ডা কী থাকছে?

● আমাদের দল উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আসরে নেমেছে। ভারত বৈশ্বিক স্তরে প্রতিযোগিতা করছে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে উন্নয়নের খিদে ক্রমশ বাড়ছে। যুবসমাজ এমন একজন নেতাকে চাইছে যিনি নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন ও মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতি করবেন। নির্বাচকগুলী তাঁদেরকেই ভোট দেবেন যে নেতৃত্বের রাষ্ট্রের জন্য স্বচ্ছ উন্নয়নের দিশা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেও গ্রহণযোগ্য। সবার জন্য উন্নয়ন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-ই হতে চলেছে বিজেপির নির্বচনী মানদণ্ড। উন্নয়নের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো শান্তি ও স্থায়িত্ব। ২০০২ সাল থেকে গুজরাটবাসী শান্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্থায়িত্বও উপভোগ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি আমদানি করে কংগ্রেস রাজ্যবাসীর শান্তি বিঘ্নিত করেছে।

□ আপনার সরকারের বড়ো সাফল্য কোনগুলি?

● আমার সরকার দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারে এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরি করতে সফল হয়েছে। ৩৬৫ দিনে আমরা পাঁচশোরও বেশি জনস্বার্থবাহী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। 'সেবা সেতু' কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এক কোটিরও বেশি মানুষের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। গুজরাটের জীবনদানকারী নর্মদা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে কয়েকমাস আগেই। এস এ ইউ এন আই এবং সুজলাং সুফলাং সেচ প্রকল্পের মতো দুটি বৃহৎ সেচ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এই সরকারেরই আমলে, যার সুফল এখন কৃষকেরা পাচ্ছেন। এই ধরনের প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে, মানুষের আয় বিশেষ করে কৃষকদের আয় বেড়েছে। এবং এর প্রভাব পড়েছে রাজ্যের জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোজেক্ট)-র ওপর। দলগত কাজ এবং বিতর্কহীন কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করি।

□ বলা হচ্ছে যে, এবারের নির্বাচনে গুজরাট বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখাপেক্ষী। আপনার কী মত?

● নরেন্দ্র ভাই একজন জাতীয় নেতা। তিনি গুজরাট থেকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর গুজরাট নির্বাচনে যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

মোদীজী আমাদের অতিরিক্ত সুবিধা। তাঁর মাপের কংগ্রেস নেতা ধারে কাছে একজনও নেই। যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন ১৮২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১২০টির মতো আসন পেয়েছিল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর উত্তরণ, সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে গত সাড়ে তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য আমাদের ১৫০টি আসন পেতে সাহায্য করবে। দেশবাসী জানেন যে মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে আর্থিক দুর্নীতি কীভাবে দেশে মাথাচাড়া দিয়েছিল এবং তাঁর ১০ বছরের সময়কালে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমরা জনগণের সামনে আনব কীভাবে কেন্দ্রে মোদী সরকার স্বচ্ছ-প্রশাসন উপহার দিয়েছেন।

□ আপনি কি মনে করেন যে গুজরাটের নির্বাচনী প্রচার স্থানীয়ের তুলনায় জাতীয় বিষয়গুলিকে ভিত্তি করেই হবে এবং সেক্ষেত্রে মোদী বনাম রাহুল যুদ্ধ হতে চলেছে।

● এটা সত্য নয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কংগ্রেস জাতীয় ইস্যুগুলিকে তুলছে, বিশেষ করে জি এস টি এবং নোটবাতিলের মতো বিষয়, যাতে করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভীত করা যায়। এটা তাদের নোংরা রাজনীতি। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা কাজে দেবে না। আমাদের দল বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি গত সাড়ে তিন বছরে কেন্দ্রের মোদী সরকারের জনমুখী উদ্যোগগুলি নির্বাচনী প্রচারে সামনে আনবে। যেহেতু যুদ্ধের প্রসঙ্গ আপনি তুললেন, তাহলে আপনার বোঝা উচিত যখন কোনো রাজ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, জাতীয় দলের সর্বোচ্চ নেতাদের সবসময় সেখানে তুলে ধরা হয়। গত দু'দশক কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীর নামে ভোট জোগাড় করার চেষ্টা করেছিল। সেটা বিধানসভাই হোক, কিংবা লোকসভা। এখানেও তারা সেই চেষ্টা করবে কারণ অন্যান্য কিছু রাজ্যের মতো গুজরাটে আঞ্চলিক দলের কোনো অস্তিত্ব নেই।

□ কিন্তু বিগত তিনটি নির্বাচনে বিজেপি শুধুমাত্র মোদীর নেতৃত্বে সফল ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিল।

● মোদীজী একজন শক্তিশালী নেতা এবং বিগত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে প্রভূত প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেও কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর সমর্থনে এ রাজ্যে এসেছিলেন ও নির্বাচনের সময় রাজ্যজুড়ে প্রচারেও তাঁরা ছিলেন। আপনি এটা কখনোই ভাববেন না যে এই প্রথম গুজরাট নির্বাচনে রাহুল গান্ধীকে কংগ্রেস তাদের তারকা ক্যাম্পেনার হিসাবে তুলে ধরল। হতে পারে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁকে তুলে ধরার জন্যই এটা করা হলো। রাহুলকে এভাবে তুলে ধরায় আমাদেরই লাভ হবে। তিনি যেখানে যাবেন, সেখানকার মানুষই বিজেপিকে ভোট দেবেন। আমরা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি)-র সভাপতি হিসেবে তাঁর মনোনয়ন কামনা করছি, যাতে আরও তাড়াতাড়ি কংগ্রেস-মুক্ত ভারত গড়া সম্ভব হয়।

□ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল হিসেবে কি গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনকে দেখা যাবে?

● পুরোপুরিভাবে নয়। কিন্তু প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। আমরা উত্তরপ্রদেশে জয়লাভ করেছি, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে। এই রাজ্যগুলি ও আগামী মার্চে কর্ণাটকের নির্বাচন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো গত তিন বছরে কংগ্রেস অধিকাংশ নির্বাচনেই পরাজয় লাভ করেছে। প্রশ্ন হলো, যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো পরিস্থিতিতেই কংগ্রেসকে পাওয়া যাবে কিনা। ২০১৯-এ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো পরিস্থিতিতেই বিরোধীরা থাকবে না। কারণ দেশের মানুষ জানেন যে যদি কংগ্রেস সরকার কোনোভাবে ক্ষমতায় আসে তবে দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানহীনতা ও দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যাবে।

□ হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপি তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে, গুজরাটের ব্যাপারে কী বলবেন?

● এটা আমার বিষয় নয়। দলের নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমার চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে আমি নিজেকে দলের একজন সৈনিক বলেই ভেবেছি এবং দল আমাকে যা কাজ দিয়েছে আমি সততার সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি নীতিনিষ্ঠ দলকর্মী এবং দলের সিদ্ধান্তই আমার কাছে চূড়ান্ত।

□ বিগত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে আপনি বিজেপির সৌরাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। আপনি এখন মুখ্যমন্ত্রী। ওখান থেকে এবার কতগুলি আসন আশা করেন।

● ওই অঞ্চলে ৪৭টি বিধানসভা আসন রয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী বিজেপি এখান থেকে ৩৫টিরও বেশি আসনে জিতবে।

□ মোদী ম্যাজিক কাজ করবে?

● অতীতেও মোদী ম্যাজিক কাজ করেছে, এবারেও করবে। উত্তরপ্রদেশেও মানুষ মোদীর নামে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। গুজরাটেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। আগামীদিনে তাঁর জনসভা ও মিছিলগুলি ব্যাপক প্রভাব ফেলবে রাজ্যে। একটি চিঠির আকারে তাঁর আবেদন ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

□ নোটবাতিল এবং জিএসটি কি বিজেপির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না?

● এই ইস্যুগুলি কংগ্রেস তুলেছে। আমি মনে করিয়ে দেব যে নোটবাতিলের ঠিক একমাসের মধ্যে ১০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট আয়োজিত হয়েছিল গুজরাটে। ফলাফলে দেখা গেল বিজেপি ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েতেই জয়লাভ করেছে। জি এস টি-র বিষয়ে বলতে হয় যে নতুন করের দুনিয়ায় ব্যবসায়ী সমাজে কোনো সমস্যা নেই। ফর্ম ভর্তি করা বা কিছু ক্ষেত্রে কর-কাঠামো নিয়ে তাদের যে সমস্যা ছিল, হয় তার সমাধান হয়ে গেছে বা হওয়ার পথে।

বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদক বাংলার পাতে মাছ জোগান দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সংবাদে প্রকাশ রাজ্য সরকার পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে দীঘাতে ৪০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন এক মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চলেছে। এই জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে রাজি। সেই উদ্দেশে নিয়মমতো পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরির কাজে মৎস্যদপ্তর হাত দেবে। সব কিছু ঠিক ঠিক চললে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে এই হিমঘরের কাজ শুরু করবে। এর ফলে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো পূর্ব উপকূলের রাজ্যগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে রাজ্য। দেশে অগ্রণী মাছ উৎপাদক উপকূলবর্তী রাজ্যগুলো হলো অন্ধ্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, গুজরাট। পশ্চিমবঙ্গ তাদের মতো লরি ভর্তি প্রক্রিয়াকৃত মাছ ভিনরাজ্যে বা বিদেশে রপ্তানির পরিকাঠামো আজও তৈরি করে উঠতে পারেনি। গত সত্তর বছরের স্বাধীনতার যে অর্ধেক সময়ের বামপন্থী শাসনকে রাজ্যের বৃহত্তম ট্র্যাজেডি ভাবা হয় সেই সময়ে ও তার পরবর্তী ছ'বছরেও দেশে বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদক এই রাজ্যের পক্ষে তা লজ্জার।

বামফ্রন্ট শাসনকালে তৎকালীন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দকে প্রতি বছর দিল্লি গিয়ে সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদক রাজ্যের পুরস্কার আনতে দেখা যেত। যে সত্যটা উহ্য থাকতো তা হলো এই উৎপাদনটা ছিল কেবলই পোনা। সদ্যোজাত কৃষ্ণের মতো এই পোনারা অন্ধ্রপ্রদেশ নামক গোকুলে বড়ো হওয়ার জন্য যেত। আজও যায়। যেগুলো বৃদ্ধি পেলে আমরাই বহুগুণ বেশি দামে কিনে খাই। বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদক বাংলার পাতে মাছ জোগান দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ।

কলকাতায় স্কুলের পুলকার চালক পঞ্চু নস্কর এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে সে তার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামের পুকুরে আড়াইশো টাকার চারা ছেড়ে তিনমাসে বড়ো করে ১৭০০ টাকায় বিক্রি করেছে। এই ছোট্ট একটি হিসেব বলে দেয় বাংলার পোনা কিনে বড়ো করে অন্ধ্র ওড়িশারা কী পরিমাণ লাভবান হচ্ছে বছরের পর বছর। এটা এক ধরনের ড্রেইন থিয়োরির ফলিত রূপ, শিল্পের ক্ষেত্রে গত শতকে যে তত্ত্বকে দাদাভাই নৌরজী ও রমেশ দত্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক্ষেত্রে যেটা বলার তা হলো ৪০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের হিমঘর প্রয়োজনের তুলনায় নস্যি। একা মানিকতলা বাজারেরই প্রায় দৈনিক চাহিদার সমান। তার জন্য পাঁচ কোটি টাকা, তাও ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতছে সরকার। বর্তমানে যে-কোনো পাড়াতেই এই টাকা বিনিয়োগ করার মতো লোক খুঁজলে মিলতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে মাছ সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রায় তিন হাজার টন। বর্তমান রাজ্য সরকার দু' হাজার ক্লাবকে দু' লক্ষ করে টাকা দিতে চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অতীতে বাম সরকার ক্লাবগুলোকে ক্যারাম থেকে টিভি দিয়ে ও সচ্ছল পরিচালকদের ছবি বানাতে দিয়ে মোমের দু'দিক পুড়িয়েছে ফলে রাজ্য আজ অভ্যন্তরীণ ঋণের ফাঁদে বন্দি। সর্বোপরি এই পাঁচ কোটি টাকার হিমঘর যে দু' বছরেই সরকারি পরিবহণের বাস বা সরকারি হাসপাতালের মূল্যবান যন্ত্রর মতো হবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে।

বাংলায় আজ শিল্প নেই। ২০১১-এর প্রচারে শোনা ৪০,০০০ বন্ধ শিল্পের বর্তমান সংখ্যা কতো কে জানে। বজবজ রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, হুগলী, বর্ধমানের জি.টি. রোডের দু'দিকে শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করছে।

দেশে ও এশিয়ার প্রাচীনতম মেডিক্যাল কলেজের শহরের মানুষ দক্ষিণে সেইসব

অনগ্রসর অনুর্বর জেলাগুলোতে চিকিৎসার জন্য আজ যায় যেখানে কৃষি, খনি, শিল্প কিছুই জমিগত আনুকূল্য পায় না। তাই তারা চিকিৎসা ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে সফল। এর জন্য বড় শিল্পের মতো পরিকাঠামো লাগে না। আমরা এ রাজ্যের সবজি, ফল, পোল্ট্রি, মাছ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাওয়া তুলনামূলক সুবিধা নিতেও শিখিনি। উত্তরবঙ্গে বড় আনারস এবং বর্ষায় মণিপুরে জলের দামে মুসুম্বি লেবুর আকারের আনারসকে প্রক্রিয়াকৃত করার এমনকী দার্জিলিং (গোর্খাল্যান্ড বা ভেবে) উচ্চভূমির নষ্ট হওয়া রোডোডেনড্রনকে হিমাচল প্রদেশের মতো বোতলবন্দি পানীয়ে রূপ দেওয়ার কথাও ভাবিনি।

আমরা গোখেলের মুখে বাঙলা আজ যা ভাবে...বসিয়ে অক্ষয়প্রসাদ লাভে মগ্ন। একই সঙ্গে কেন্দ্র নির্ভরতা ও কেন্দ্র বিরোধিতাতেও মেতে রয়েছি। ■

ব্যবসা রুগ্ন দেখিয়ে কর্মী ছাঁটাই বন্ধ করতে চায় কেন্দ্র

তারক সাহা

মোদী জমানায় অর্থনীতির ঘড়ির কাঁটা যেন উল্টো দিকে ঘুরছে। বাণিজ্যিক শব্দ 'নিষ্ক্রমণ নীতি' (Exit Policy) উল্টো দিশায় মোড় নিচ্ছে। যদি এতে সাফল্য আসে তবে আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে দিগন্ত খুলে যাবে। মোদী সরকার যে নীতি নিয়েছে তাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের বদলে মালিক ছাঁটাই করা হবে। এতদিন মালিকপক্ষ কর্মী সংকোচন করে মুনাফা লুটছিল এবং সংস্থাগুলিকে রুগ্ন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা রাজনৈতিক নেতা-সহ অপটু ব্যাংক কর্মচারীদের সহায়তায় ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করত।

বর্তমানে সরকার এক নয়া ফরমান জারি করেছে যে, মালিকপক্ষ তার ব্যবসাকে রুগ্ন দেখিয়ে ঋণ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে মালিক পক্ষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সব বকেয়া ঋণ আদায় করা হবে। এই মর্মে Insolvency and Bankruptcy code 2016-র মাধ্যমে দেশের শীর্ষ ব্যাংক তার অধীনস্থ ব্যাংকসমূহকে অনাদায়ী ঋণ আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশের ফলে বর্তমান মালিকপক্ষ যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তবে ব্যাংক অনাদায়ী ঋণ আদায় করতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির নতুন ক্রেতা খুঁজে বের করে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করবে।

এটা বর্তমান সরকারের এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। গত জুন মাসে দেশের শীর্ষ ব্যাংক হিসেব করে দেখেছে যে, দেশের ১২টি শীর্ষস্থানীয় সংস্থার বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপের অভিযান চালিয়ে দেখা গেছে প্রতিটি সংস্থা দেশের ব্যাংকগুলি থেকে গড়ে ৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা ফেরত দেয়নি। এই ১২টি সংস্থার কাছেই ব্যাংকগুলি পায় ১,৭৫,০০০ কোটি টাকা (ব্যাংকগুলির মোট অনাদায়ী ঋণের পঁচিশ শতাংশ)। যে শিল্পগুলি ঋণ শোধ না করে বসে রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ভূষণ স্টিল এবং ইলেকট্রোস্টিল অ্যান্ড ল্যাঙ্কো ইনফ্রাটেকের মতো সংস্থা। এই পরিমাণ অর্থ আদায় হলেই মোদীর স্বপ্নের বুলেট ট্রেন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে জাপানের সাহায্য ছাড়াই। যে সমস্ত তথ্য সামনে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে দেশের শীর্ষ ব্যাংক (আর.বি.আই) অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য ৫০০টি এমন সংস্থার তালিকা তৈরি করেছে যাতে দেশের অন্য বড় শিল্পসংস্থাও শামিল। এর মধ্যে রয়েছে ভিডিওকন, জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড প্রভৃতি সংস্থা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করতে। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রক বার্তা পাঠিয়ে বড় শিল্পসংস্থাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে অনেক হয়েছে, আর নয়। কঠোর আর্থিক অনুশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ করতে চাইছে কেন্দ্র।

এদেশের শিল্পপতিরা রাজনীতির ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে ঋণ খেলাপের সুবিধা পেয়েছে। দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সেই জমানা সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। বিজয় মাল্যের কথাই ধরা যাক। মোদী জমানা শুরু হওয়ার পর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ের সুযোগ নিয়ে বিজয় মাল্য ৯,০০০ কোটি টাকা অনাদায়ী রেখে দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। রাজনীতির ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে অমিত বিক্রমে তিনি ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ নিয়ে গেছেন। বিজয় মাল্য এতটাই ক্ষমতা ধরতেন যে, তাঁর কিংফিশার কোম্পানি ডুবন্ত জেনেও ব্যাংকগুলি অকাতরে ঋণ দিয়ে গেছে। ভেবেছিলেন যে, রাজনীতির দাদাদের ধরে রেহাই পাবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ২০১৪-তে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সমস্যা বাড়ল মাল্যের। দেশ ছাড়তে হলো। তাঁর ইউনাইটেড ব্রিওয়ারিজ, ইউনাইটেড স্পিরিটের মতো সংস্থাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডির দাবি ওই দুই সংস্থা বিক্রি করে অনাদায়ী ৯,০০০ কোটি টাকার পুরোটাই পাওয়া যাবে। অপেক্ষা শুধু আদালতের নির্দেশের।

এসার গ্রুপ তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে প্রচুর ঋণ নেয় ব্যাঙ্ক থেকে। ঋণদাতারা বাধ্য হয়ে ঋণ আদায়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ তৈলশোধনাগার, ১০১০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ শিল্প, ৩৫০০ টি ফিলিং স্টেশন বিক্রি করে। এগুলি বিক্রি করে ১২.৯ বিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে তা দিয়ে গ্রুপের অর্ধেক দেনা মিটেছে। এই গ্রুপের আরও ৩৯০ হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ রয়েছে। ২০০০ সালের পর জয়প্রকাশ গ্রুপের ধূমকেতুর মতো উত্থান হয়। ঋণলব্ধ অর্থ গ্রুপটি পরিকাঠামো ও রিয়েল এস্টেটে লগ্নি শুরু করে। এরপরেই তার বেলুন চুপসে যায়। ব্যাংক ঋণ নেওয়া হয় ব্যবসা বৃদ্ধি হচ্ছে দেখিয়ে। কিন্তু নতুন জমানায় ব্যাংক অনাদায়ী ঋণ আদায়ে চাপ দিতে থাকায় গ্রুপ তাদের সিমেন্ট প্ল্যান্ট বিড়লাদের ১৩ হাজার কোটি টাকায় বেচে দেয়। আগে কোনও গ্রুপকে চালু প্রকল্প বেচে দিতে দেখা যায়নি।

অতীতে ব্যাংকগুলি কোনও প্রতিষ্ঠানকে ততক্ষণ ঋণ দিত যতক্ষণ পর্যন্ত না সংস্থাটি ব্যর্থ বা অকেজো হয়ে পড়ছে এবং সংস্থাটি কর্মীদের বেতন না দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। নতুন যুগে পরিস্থিতির সঙ্গে শর্তও বদলাচ্ছে ঋণের। এখন ব্যাংকগুলি ঋণখেলাপি সংস্থার ভালো সম্পদ থাকলে ব্যাংক তাদের বলছে নতুনভাবে, নয়া উদ্যমে ব্যবসা শুরু করতে নইলে তারা সম্পদ বেচে নতুন মালিকের হাতে দিয়ে দেবে পরিচালনার দায়িত্ব। এতে মালিক বদলে গেলেও কর্মীদের চাকরি থাকবে। প্রস্তাব ভালো, ভাবনা ভালো। কিন্তু বাস্তবে তা কতটা ফলপ্রদ হয় সেটাই এখন দেখার। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

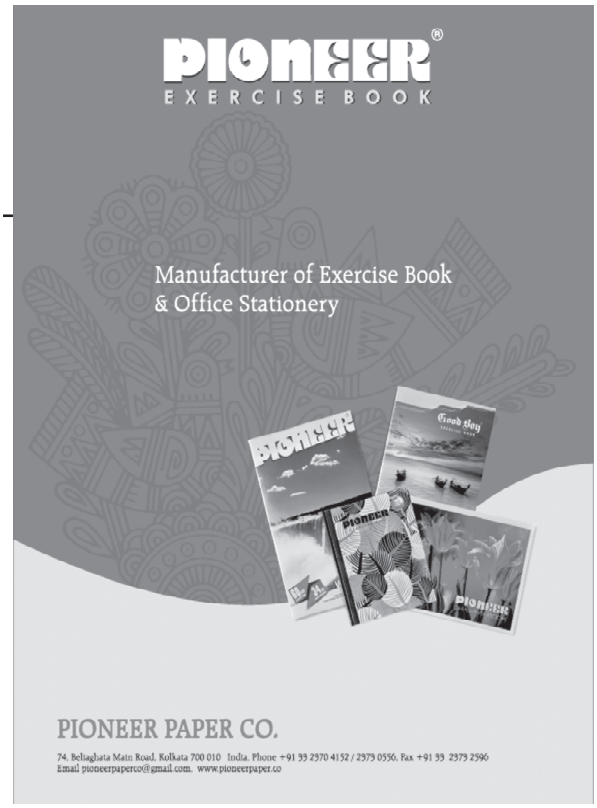

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

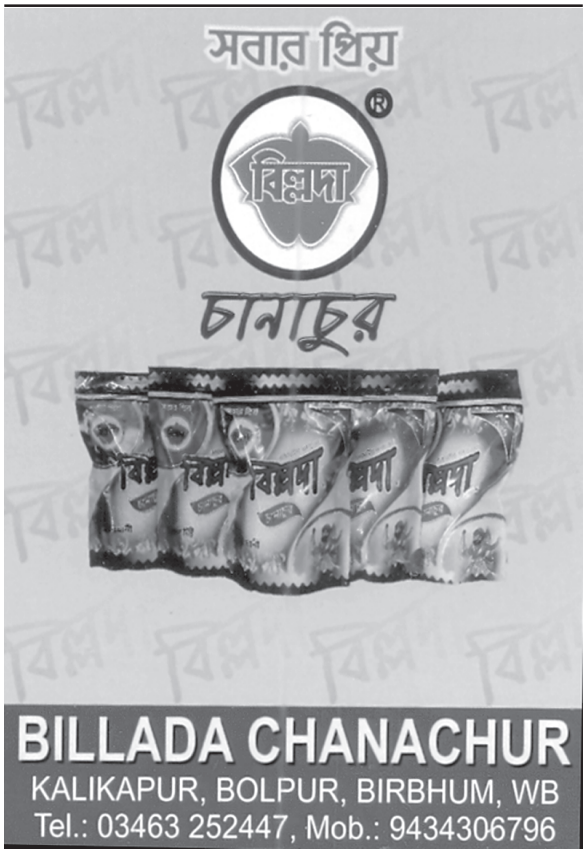

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্ব বাংলা সত্যের সন্ধানে

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে বাংলা অতলে তলিয়ে যাচ্ছে— ৩৪ বছরের বাম শাসনে এবং বর্তমানে মা-মাটি-মানুষের শাসনে। বাংলা বিশ্বে গেলে, মহাবিশ্বে গেলে, মহাকাশে গেলে কারও আপত্তি করার কারণ নেই! খণ্ডহরে রঙের বন্যা বইয়ে আর মুখচ্ছবির বন্যাতে ভাসতে ভাসতে বাংলা বিশ্বে পৌঁছে আজ বিশ্ববাংলা হয়েছে।

বিশ্ব বাংলার দোলায় বাংলার মসনদে দোলা লেগেছে। বাংলার মসনদ টলবে কিনা সময় বলবে। কিন্তু কেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে 'বিশ্ব বাংলা'?

২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সি. জে. অ্যাসোসিয়েট সলিসিটর ফার্ম ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৯৯ অনুসারে টিএম-১ ফর্ম পূরণ করে বিশ্ব বাংলা ট্রেডমার্ক (পণ্য চিহ্ন) নথিভুক্ত করার আবেদন জানায়। এই আবেদন করা হয়েছিল ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৯৯ ধারা ১৬, ৩৫ ও ৪১ অনুসারে।

এখন বলা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের তিন আধিকারিকের নামে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির (ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটি) নামে বিশ্ব বাংলা নথিভুক্ত করা হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ২০ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে বিশ্ব বাংলার স্বত্ব দাবি করা হলো। কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ১৮ মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা করে হিসাব দাখিল ও নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন বাধ্যতামূলক এবং সেই হিসাব রেজিস্ট্রার অব কোম্পানির কাছে দাখিলও বাধ্যতামূলক ৩০ দিনের মধ্যে।

সরকারি ভাবে, ২০১৭ সালের মে মাসে ট্রেডমার্ক জার্নালে প্রকাশিত নথি অনুসারে, বিশ্ব বাংলার দাবিদারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন এও বলা হচ্ছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২ নভেম্বর, ২০১৭ সলিসিটার ফার্ম সি. জি. অ্যাসোসিয়েটকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি 'বিশ্ব বাংলা' ব্রান্ডের বিষয়ে আগ্রহী নন। সি. জি. অ্যাসোসিয়েট কবে ট্রেডমার্ক অথরিটির কাছে বিশ্ব বাংলা ট্রেডমার্ক প্রত্যাহারের আবেদন জমা করেছে— তা এখনও অজানা। কারণ, ব্যক্তিগত পত্র ও

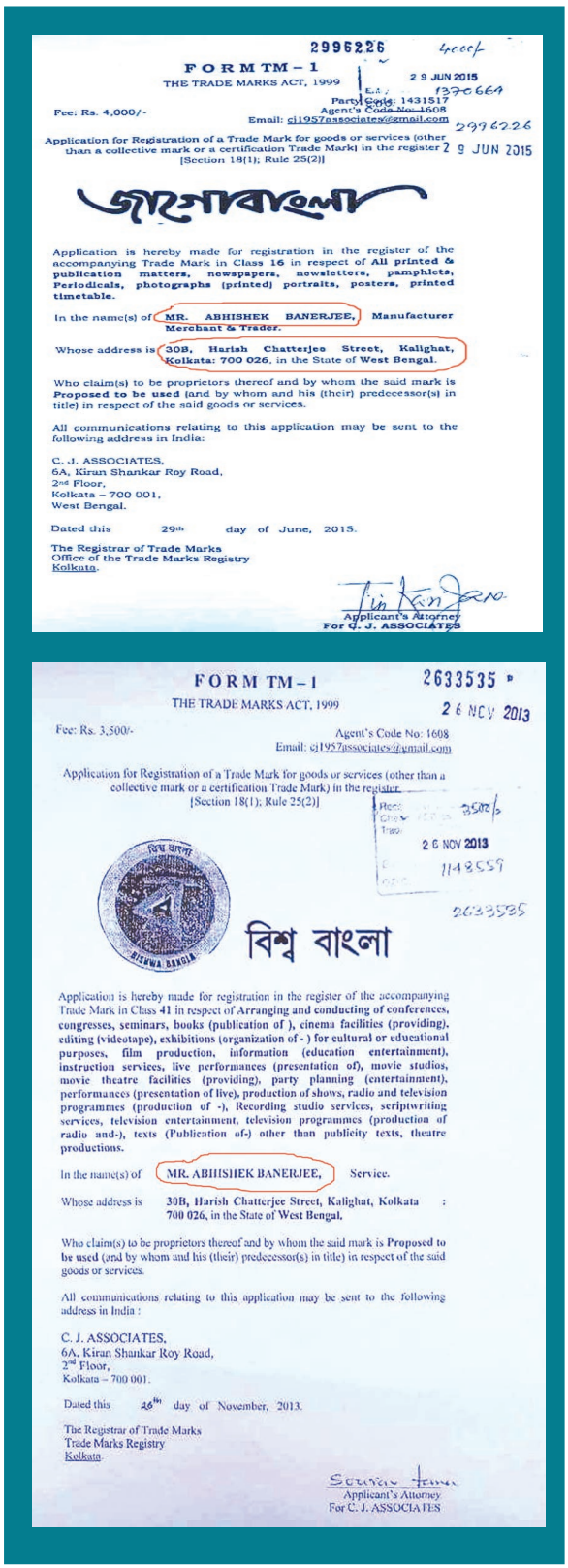

2996226

FORM TM – 1
THE TRADE MARKS ACT, 1999

29 JUN 2015

Fee: Rs. 4,000/-

Agent's Code No: 1608
Email: cj1957associates@gmail.com

Application for Registration of a Trade Mark for goods or services (other than a collective mark or a certification Trade Mark) in the register [Section 18(1); Rule 25(2)]

29 JUN 2015

জাগোবাংলা

Application is hereby made for registration in the register of the accompanying Trade Mark in Class 16 in respect of **All printed & publication matters, newspapers, newsletters, pamphlets, Periodicals, photographs (printed) portraits, posters, printed timetable.**

In the name(s) of **MR. ABHISHEK BANERJEE,** **Manufacturer Merchant & Trader.**

Whose address is **30B, Harish Chatterjee Street, Kalighat, Kolkata: 700 026,** in the State of **West Bengal.**

Who claim(s) to be proprietors thereof and by whom the said mark is **Proposed to be used** (and by whom and his (their) predecessor(s) in title) in respect of the said goods or services.

All communications relating to this application may be sent to the following address in India:

C. J. ASSOCIATES,
6A, Kiran Shankar Roy Road,
2nd Floor,
Kolkata – 700 001,
West Bengal.

Dated this 29th day of June, 2015.

The Registrar of Trade Marks
Office of the Trade Marks Registry
Kolkata.

Applicant's Attorney
For C. J. ASSOCIATES

FORM TM – 1
THE TRADE MARKS ACT, 1999

2633535

26 NOV 2013

Fee: Rs. 3,500/-

Agent's Code No: 1608
Email: cj1957associates@gmail.com

Application for Registration of a Trade Mark for goods or services (other than a collective mark or a certification Trade Mark) in the register [Section 18(1); Rule 25(2)]

26 NOV 2013

বিশ্ব বাংলা

Application is hereby made for registration in the register of the accompanying Trade Mark in Class **41** in respect of **Arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, books (publication of), cinema facilities (providing), editing (videotape), exhibitions (organization of -) for cultural or educational purposes, film production, information (education entertainment), instruction services, live performances (presentation of), movie studios, movie theatre facilities (providing), party planning (entertainment), performances (presentation of live), production of shows, radio and television programmes (production of -), Recording studio services, scriptwriting services, television entertainment, television programmes (production of radio and-), texts (Publication of-) other than publicity texts, theatre productions.**

In the name(s) of **MR. ABHISHEK BANERJEE,** Service.

Whose address is **30B, Harish Chatterjee Street, Kalighat, Kolkata : 700 026,** in the State of **West Bengal.**

Who claim(s) to be proprietors thereof and by whom the said mark is **Proposed to be used** (and by whom and his (their) predecessor(s) in title) in respect of the said goods or services.

All communications relating to this application may be sent to the following address in India :

C. J. ASSOCIATES,
6A, Kiran Shankar Roy Road,
2nd Floor,
Kolkata – 700 001.

Dated this 28th day of November, 2013.

The Registrar of Trade Marks
Trade Marks Registry
Kolkata.

Applicant's Attorney
For C. J. ASSOCIATES

प्रारूप औ - 2
Form O - 2

भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999
व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 62 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 62 (1)

क्रमांक
No. 1307985

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 2462807 दिनांक /Date 18/01/2013 ज. संख्या /J. No. 1726

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह .... के बारे में दिनांक .... नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।
Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-
ABHISHEK BANERJEE, 30B,HARISH CHATTERJEE STREET, KALIGHAT, KOLKATA - 700 026, WEST BENGAL., AN INDIAN PROPRIETORSHIP FIRM., SERVICE., (Single Firm)

In Class 38 Under No. 2462807 as of the date 18 January 2013 in respect of

Goods and service as annexed

MAA-MATI-MANUSH

मेरे निर्देश पर आज .... के .... मास के .... वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई
Sealed at my direction, this 12th day of August, 2016

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.
This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.
Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.

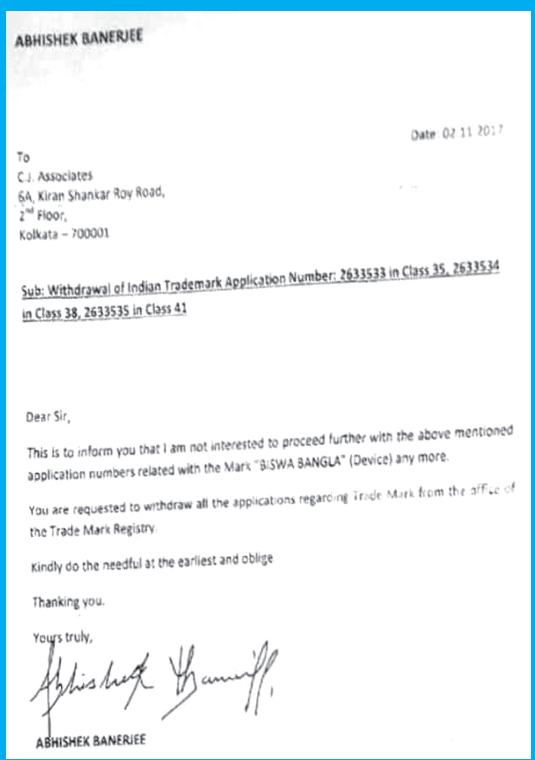

ABHISHEK BANERJEE

Date: 02.11.2017

To
C.J. Associates
6A, Kiran Shankar Roy Road,
2nd Floor,
Kolkata – 700001

Sub: Withdrawal of Indian Trademark Application Number: 2633533 in Class 35, 2633534 in Class 38, 2633535 in Class 41

Dear Sir,

This is to inform you that I am not interested to proceed further with the above mentioned application numbers related with the Mark "BISWA BANGLA" (Device) any more.

You are requested to withdraw all the applications regarding Trade Mark from the office of the Trade Mark Registry.

Kindly do the needful at the earliest and oblige

Thanking you.

Yours truly,

ABHISHEK BANERJEE

প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা পৃথক।

অন্তর্বর্তী সময়ে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটি কীভাবে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করল? স্বরাষ্ট্র সচিব ও বিভাগীয় সচিব বলছেন মুখ্যমন্ত্রী ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, চুক্তি আইন অনুসারে নিজের থেকে উন্নত অধিকারী কাউকে অর্পণ করা যায় না। যেখানে আইনের চোখে প্রত্যেকের পৃথক সত্তা আছে সেখানে অভিষেক ব্যানার্জীর ট্রেডমার্ক 'বিশ্ব বাংলা' মুখ্যমন্ত্রী নিলেন কীভাবে? বরং ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটির পণ্যচিহ্ন সংক্রান্ত আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ রেজিস্ট্রার অব ট্রেডমার্ক কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আপনাদের লোগো সংক্রান্ত আবেদনে ইতিমধ্যেই আপত্তি এসেছে। যার সদুত্তর না পাওয়ার জন্য বাতিল করা হয়েছে। পুনরায়, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটির পক্ষ থেকে বিশ্ব বাংলার লোগো পাওয়ার বিষয়ে আপত্তি এসেছে, আপত্তি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার মানুষের প্রশ্ন, বিশ্ব বাংলা নিয়ে হচ্ছেটা কী? রাজ্য সরকারের শেয়ারদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি (মা-মাটি মানুষের সরকার) আর শাসক দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোন মধুভাণ্ড নিয়ে এই দড়ি টানাটানি? মধুভাণ্ডের সুধা পান করতে চাইছে দু'পক্ষ। 'চুপ সরকার চলছে' বললেও মানুষ চুপ থাকতে পারছে না। ডেঙ্গু আক্রান্ত রাজ্যের মুখ আজ 'বিশ্ব বাংলা'র বিজ্ঞাপন ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে ঢেকেছে। রাজ্যবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ়! বুদ্ধিজীবীরা পরজীবীতে রূপান্তরিত। হারিয়ে যাওয়া পিএইচডি'র ক্ষত ডিলিটে মুছতে চাইছেন। বাংলার গরিমা, বাংলার স্বাভিমান আজ অস্তমিত।

'বিশ্ব বাংলা সরণী' (যদিও সরণী এখনও ধরণীতে পৌঁছোয়নি), 'বিংশ্ব বাংলা বিপণি', 'বিশ্বকাপ এখন বিশ্ব বাংলায়' স্লোগানের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হচ্ছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গ শব্দের অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বিস্মৃতি ঘটছে। সরকারি ব্যয়ে কি বেসরকারি সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে? না বেসরকারি ব্রান্ড ব্যবহারের জন্য প্রচুর ব্যয় হচ্ছে? কোনো তথ্য এখনও হাতে আসেনি যাতে বলা যাবে, অলাভজনক উদ্দেশ্যে ব্রান্ড 'বিশ্ব বাংলা' তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন হলো পেটেন্ট, কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক ব্যবসায়িক কারণে তৈরি করা হয়ে থাকে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীই অন্দরমহল থেকে তিনটি লোগো 'বিশ্ব বাংলা', 'জাগোবাংলা' ও 'মা-মাটি-মানুষ' ব্যবসায়িক কারণে ব্রান্ড হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নথিভুক্ত করাতে চেয়েছেন। সততা ব্রান্ড কি ফিকে হচ্ছে? ■

'বিশ্ব বাংলা'র মালিকানা কার জানার অধিকার রয়েছে জনসাধারণের

দেবাংশু ঘোড়ই

সম্প্রতি 'বিশ্ব বাংলা'-র মালিকানা নিয়ে যে কাজিয়া বা ঝড় উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারের অন্দরমহলে তা যে আগামীদিনে একটা বিশেষ রূপ পেতে চলেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন বক্তব্য হলো, প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে চলেছে। আদতে আইনি কী ব্যাখ্যা বা কী হতে পারে সে নিয়েই একটু আলোচনা করা যাক।

বলার অপেক্ষা রাখে না মুকুল রায় যে দাবি করেছেন তা একশো ভাগ সত্য। আর তা হলো ৮.৫.২০১৭-র ট্রেডমার্ক জার্নাল নং-১৭৫৬ অনুযায়ী ক্লাস-৪১ এর অন্তর্গত ২৬৩৩৫৩৫-এ 'বিশ্ব বাংলা'-র মালিক হিসেবে অভিষেক ব্যানার্জীরই নাম ও ঠিকানা হিসেবে ৩০বি, হরিষ চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতা-৭০০০২৬ দেওয়া আছে। ওই দরখাস্ত অভিষেক ব্যানার্জীর হয়ে যে ট্রেডমার্ক এজেন্ট আবেদন করেছিলেন তার নাম ও ঠিকানা—সি.জে. অ্যাসোসিয়েটস্, ৬এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১। এই বিশ্ব বাংলা লোগো কী কী কাজে ব্যবহৃত হবে তাও ওই জার্নালের পাতাতেই লেখা রয়েছে। http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/ IPOJournal/1466_1/CLASS-41-42.pdf লিঙ্কটিতে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন। ট্রেডমার্ক আইনানুযায়ী বলা হচ্ছে, যদি কোনো বিশেষ ট্রেডমার্কের বিরুদ্ধে কারুর কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকে সে বা তিনি কোনো ট্রেডমার্ক জার্নালে প্রকাশের পর চার মাসের মধ্যে তাঁর অভিযোগ ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রিতে জানাতে পারেন। রাজ্য সরকারের নিজের দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী তারা ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে তাঁদের অভিযোগ বা আপত্তি দায়ের করেন যা কিনা কোনো রকম অভিযোগ/আপত্তি দায়ের করার শেষ দিন ছিল। খবরে প্রকাশ, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের করা ওই সরকারি অভিযোগ/আপত্তি খারিজ করা হয়। অর্থাৎ বলার অপেক্ষা রাখে না, এখন পর্যন্ত 'বিশ্ব বাংলা'-র মালিকানা অভিষেক ব্যানার্জীর নামেই রয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও বিশদে জানার দুটি রাস্তা রয়েছে। এক, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রিতে বিশদভাবে দরখাস্ত করে জিজ্ঞেস করা 'বিশ্ব বাংলা'-র মালিকানা কার নামে রয়েছে এবং ওই ট্রেডমার্কের বর্তমান অবস্থা। দুই, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রিতে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুযায়ী 'বিশ্ব বাংলা' ট্রেডমার্কের আজ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য চেয়ে একটি দরখাস্ত করা যার বলে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

একটি প্রেস কনফারেন্সে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব অত্রি ভট্টাচার্য স্বীকার করেন তাঁদের করা দরখাস্ত বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয় এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা ওই লোগো ব্যবহার করে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপ চিহ্ন হিসেবে। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন থেকে যায়, অভিষেক ব্যানার্জীর নামে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও বা যদি নাও থেকে থাকে তার সঠিক তথ্য না জানা পর্যন্ত কোনো সরকার কি অন্য কারুর নামে রেজিস্ট্রি করা ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে পারেন? যদি এর উত্তর 'না' হয়, তাহলে আখেরে রাজ্যসরকার স্বয়ং বেআইনিভাবে 'বিশ্ব বাংলা' ট্রেডমার্ক ব্যবহারের জন্য অপরাধী যার দায় রাজ্য সরকার কোনোমতেই এড়াতে পারেন না।

তিনি আরও বলেন, এই লোগো ব্যবহার করার জন্য অনেকেই নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে চেষ্টা করে চলেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে ওই সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য চেয়ে অর্থাৎ কে বা কারা ওই লোগো ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? এই সমস্ত তথ্য চেয়েও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে একটি আরটিআই করা উচিত। যদিও তদন্ত চলাকালীন কোনো বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করতে কোনো সরকারই বাধ্য নয়, তবে তা তখনই যখন সেই তদন্তের বিষয়বস্তু রাজ্যের বা দেশের নিরাপত্তাসম্বন্ধীয় হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় 'বিশ্ব বাংলা' লোগো ব্যবহার করার ফলে কি রাজ্যের নিরাপত্তা নড়ে যেতে পারে? আর যদি তা না যায় তবে ওই তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই আরটিআই আবেদনকারীকে জানানো রাজ্য সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যদি 'বিশ্ব বাংলা' ট্রেডমার্কের মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার না হয়, যদিও খাতায় কলমে এখনো তা নয়, তবে তা জনসমক্ষে ব্যবহার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যেমন এক ধরনের অপরাধ সেরকমই তা থেকে অর্থ উপার্জন করা আরও বড় রকমের অপরাধ। অনুর্ধ্ব ১৭ ফিফা বিশ্বকাপে ওই লোগো কাজে লাগিয়ে যে অর্থ উপার্জন হয়েছে তা কোথায় গেছে বা কীভাবে খরচ হয়েছে তাও জানা যেতে পারে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুযায়ী।

শেষত, মুকুল রায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের দুজন সিনিয়র আই.এ.এস অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন মিথ্যা তথ্য জনসমক্ষে পেশ করার জন্যে। এই ঘটনার সত্য-মিথ্যা ব্যাতিরেকে এটুকু বলতেই পারা যায় যদি তা সত্য প্রমাণ হয় তাহলে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (কন্ডাক্ট) রুলস, ১৯৬৮ এবং অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আপিল) রুলস, ১৯৬৯ অবমাননার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনাল অ্যান্ড ট্রেনিং ওই দুই অফিসারের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেই পারেন।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী)

খড়ের কাঠামো বেরিয়ে পড়বে না তো?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

খুব কৌশলে তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের একটি ভাবমূর্তি গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভাবমূর্তিটি 'সততার প্রতীক'-এর। এই প্রতীকের অঙ্গ ছিল কালীঘাটে টালির ঘরে বাস, সাদা শাড়ি এবং হাওয়াই চটির জীবনযাত্রা। সততার প্রতীক লেখা তাঁর কাটআউটে সারা রাজ্য ছেয়ে দিতে কসুর করেনি মমতা- অনুগামীরা। এতাবৎকাল পর্যন্ত তিনিই বাংলার এক এবং অদ্বিতীয়া সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব— এরকম একটি প্রচার সুকৌশলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এবং বলতেই হবে তা করে রাজনৈতিক সুবিধাও তিনি অনেকখানিই পেয়েছেন। বাংলার মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সততা প্রশ্নাতীত। এবং একথা অস্বীকারও করা যাবে না— এখনও গ্রাম বাংলার এক বৃহৎ অংশের মানুষ এই 'সততার প্রতীক'-এর প্রচারে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। নিজের এই ভাবমূর্তিটি গড়ে তোলার পিছনে মমতার মূল রাজনৈতিক কৌশলটি ছিল অন্য। মমতার রাজনৈতিক জীবন শুরু সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করার ভিতর দিয়ে। মমতা যখন সিপিএমের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছেন, তখন এই রাজ্যের বাম নেতাদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ সম্পর্কে জনমানসে নানারকম প্রশ্ন উঠছে। মমতা বুঝতে পেরেছিলেন, সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে অতি সাধারণ, সৎ ভাবমূর্তি তাঁকে প্রচার করতেই হবে। তাই, শুরু থেকেই সাদা শাড়ি আর হাওয়াই স্যান্ডেলে নিজেকে সততার প্রতীক করে তুলতে কসুর করেননি তিনি। এবং এখনও মমতা জানেন— তাঁর এই গড়ে তোলা ভাবমূর্তিটিই তাঁকে একমাত্র রাজনৈতিক সাফল্য এনে দিতে পারে। মমতা এও জানেন, এই ভাবমূর্তিটিতে যদি কোনোদিন আঘাত লাগে, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎটিই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অথচ, এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটিই যে একমাত্র 'সততার প্রতীক'— এই প্রচার যে কতখানি ভ্রান্ত সেই প্রশ্নও কিন্তু এই অবধি কেউ তোলেনি। মমতা ব্যানার্জি রাজনীতিতে প্রবেশ করার অনেক আগেই এই রাজ্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মাখন পাল, অশোক ঘোষ, হরিপদ ভারতী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের দেখেছে। মমতার সমসময়েও তাঁরই রাজনৈতিক সহকর্মী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়দেরও মানুষ দেখেছে। এঁদের প্রত্যেকেরই সততা প্রশ্নাতীত। কিন্তু মমতার সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এই যে, পাড়ার মোড়ে কাটআউট লাগিয়ে এঁরা নিজের সততার প্রচার করতে নামেননি। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন মনে জাগে— স্রেফ রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে যিনি সততাকেও বাজারের পণ্যের মতো ব্যবহার করেন— তাঁর সততা কি সত্যই আন্তরিক, নাকি একেবারেই আরোপিত? 'সততার প্রতীক' সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিই এতদিন কেউ করেননি। কেউ জানতেও চাননি— কালীঘাটের টালির বাড়ির মালকিনের পরিবার কোন জাদুমন্ত্রে গত কয়েক বছরে হাজরা এবং কালীঘাট অঞ্চলের একাধিক বহুতল বাড়ির মালিক হয়ে গেল। কেউ জানতে চাননি, টালির বাড়ির মালকিনের ভ্রাতুষ্পুত্র কোন জাদুবলে কালীঘাট এলাকার বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক হলেন? কেউ জানতে চাননি— যে সাদা শাড়ি এবং হাওয়াই চপ্পলে সততার প্রতীক সেজে উঠেছেন— সেই সাদা শাড়িগুলি ধনেখালি থেকে কোন বিধায়ক ফরমাশ করে বানিয়ে এনেছেন? কত দামের শাড়ি সেগুলি? কেউ জানতে চাননি— পায়ের ওই সাদা চপ্পলটি কোন বিদেশি জুতো প্রস্তুতকারক সংস্থার তৈরি মেডিকেটেড চপ্পল? মাত্র আট হাজার টাকা মূল্যের ওই চপ্পলজোড়া বছর বছর কেন পালটাতে হয়? কেউ জানতে চাননি বলেই বাজারে সততার প্রতীক প্রচারটি এতদিন চালিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু কথায় আছে, চালাকির দ্বারা কোনোদিন কোনো মহৎ কার্য সিদ্ধি হয় না। একদিন না একদিন ফাঁকিবাজিটা ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। সততার প্রতীক কাটআউটের আড়ালে যে ফাঁকিবাজিটি রয়েছে— সেটিও এখন ক্রমে ধরা পড়ছে। সুকৌশলে যে ভাবমূর্তিটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তুলেছেন— এখন সরাসরি সেই ভাবমূর্তিতেই আঘাত লেগেছে। আর আঘাতটি এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী, অধুনা বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের পক্ষ থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের অন্যতম সঙ্গী মুকুল রায় জানেন, সততার প্রতীক ভাবমূর্তির ফাঁকিবাজিটি যদি মানুষের সামনে উন্মোচন করে দেওয়া যায়— তাহলেই একমাত্র মমতার রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। বিজেপিতে আবির্ভাবের প্রথম লগ্নেই সেই কাজটি খুব সুকৌশলে এবং দক্ষতার সঙ্গে করেছেন মুকুল। গত ১০ নভেম্বর রানি রাসমণি রোডে বিজেপির জনসমাবেশে নথিপত্র দেখিয়ে মুকুল বলেছেন— যে বিশ্ব বাংলার লোগোটি সরকারি লোগো হিসেবে ব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী— সেই লোগোটি আসলে রেজিস্ট্রি করা আছে মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির নামে। অর্থাৎ একটি বেসরকারি কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির লোগো সরকারি লোগো হিসেবে চালানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম একটি অভিযোগের পর এইরকম একটি সন্দেহ সর্বত্রই দেখা দিয়েছে যে, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তার লোগো ব্যবহার করতে দেওয়ার পরিবর্তে কি ভবিষ্যতে সরকারের কাছে অর্থ দাবি করবে? সন্দেহ এরকমও উঠছে যে, একটি বেসরকারি কোম্পানির লোগো সরকারের সর্বত্র ব্যবহার

করার পিছনে তাহলে কী উদ্দেশ্য ছিল— ওই কোম্পানিটির প্রচার, নাকি অর্থের বিনিময়?

বলাই বাহুল্য, মুকুল রায় চাঁদমারিটি ভালো জায়গায় করেছেন। ঠিক যে জায়গাটিতে তিনি আঘাত দিতে চেয়েছেন, সেই জায়গাটিতেই যে আঘাত লেগেছে— বোঝা গেছে তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলিতে। প্রকাশ্য জনসভায় মুকুল রায় এমন একটি অভিযোগ করার পর তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তার বিরোধিতায় আসরে নেমে পড়েছেন। অবশ্য এতেও তৃণমূল নেত্রীর স্বস্তি হয়নি। রাজ্য সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ আমলাকেও মুখ্যমন্ত্রী আসরে নামিয়েছেন মুকুলের অভিযোগের বিরোধিতা করতে। একটি রাজনৈতিক দলের আনা অভিযোগ খণ্ডন করতে আর একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোনো সরকারি আমলাকে আসরে নামানো যায় কিনা— প্রশ্ন তা নিয়েও উঠেছে। অবশ্য এসব প্রশ্নে কান দেওয়ার সময়ও নেই মুখ্যমন্ত্রীর। কেননা, তিনি কোনো নিয়ম-নীতিরই তোয়াক্কা করেন না। এক কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর সাধের বিশ্ববাংলাকে কেন্দ্র করে সন্দেহ এবং সংশয়ের ধোঁয়া ক্রমশই গাঢ় হচ্ছে।

বিশ্ব বাংলা প্রসঙ্গে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁর বাজনদাররা দাবি করছেন— মুকুল রায়ের এইসব অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। বাজনদাররা যতই দাবি করুন না কেন— অভিযোগের সারবত্তা যে যথেষ্ট আছে তা তথ্যপ্রমাণই প্রমাণ করে দিচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাংলার প্রথম স্টল উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, বিশ্ববাংলার লোগোর স্বত্বাধিকার নিয়ে রাখতে। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের আগেই ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র ওই লোগোর স্বত্ব চেয়ে আবেদন করে রেখেছেন। ২০১৪ সালের ১১ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জমা করা পাঁচটি আবেদনপত্রের ভিতর চারটি তুলে নিলেও একটি তোলেননি। উপরন্তু, ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ রাজ্য সরকার বিশ্ব বাংলার স্বত্ব চেয়ে আবেদন করেছিল তা নাকচ হয়ে গিয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে একটি বেসরকারি কোম্পানির আবেদন করা স্বত্বকে সরকারি লোগো হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছিল। গত ১০ নভেম্বর মুকুল রায় বিজেপির জনসভায় এ সংক্রান্ত নথিপত্র সামনে আনতেই মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্ব বাংলার স্বত্ব সংক্রান্ত পঞ্চম আবেদনপত্রটি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানেই রহস্যটি ঘনীভূত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রশাসন তো জানতেন--- বিশ্ব বাংলার লোগোটির স্বত্ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র দাবি করে বসে আছেন। এটি জানার পরেও কীভাবে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে, এমনকী, কলকাতায় অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে এই লোগোটি ব্যবহৃত হলো। মুখ্যমন্ত্রীর যদি সরকারি ভাবে এই লোগোটি ব্যবহারের ইচ্ছাই থাকত, তাহলে তো তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর দলের সাংসদও বটে, নির্দেশ দিতে পারতেন তো স্বত্ব চেয়ে জমা দেওয়া আবেদনগুলি প্রত্যাহার করে নিতে। তা না করে, সম্পূর্ণ তথ্য গোপন করে এই বিশ্ব বাংলা লোগোটি ব্যবহার করা হলো কেন? সততার বড়াই করা মুখ্যমন্ত্রী এই ছলনার আশ্রয় নিলেন কেন? তদুপরি, এতদিন এই সত্য আড়াল করেই কাজকর্ম চলছিল। মুকুল রায় জনসভায় বোমা ফাটাতেই তড়িঘড়ি আবেদন প্রত্যাহার কেন? উদ্দেশ্য মহৎ হলে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই আবেদন প্রত্যাহার করতে পারতেন।

জল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে না শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসে। কেননা, সত্য আড়াল করে বিশ্ব বাংলার লোগো এভাবে সরকারি কাজে ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী সে নিয়ে সন্দেহ থাকবেই। আর সেই সন্দেহবশত যদি অনুসন্ধান করে সত্য উদ্ঘাটনের কাজে কেউ ব্রতী হন— তাহলে ভবিষ্যতে অনেক চমকপ্রদ ঘটনা সামনে চলে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইতিমধ্যে আর একটি বিস্ফোরক তথ্যও সামনে এসেছে। তা হলো, তৃণমূল কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটির পেটেন্ট এক ব্যক্তিবিশেষের। এই ব্যক্তিবিশেষটিও আর কেউই নন— মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন অনুযায়ী সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস, জোড়া ঘাসফুল, মা-মাটি-মানুষ এবং জাগোবাংলা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। এবার যে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন— তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তার কী হবে? তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল, জেলায় জেলায় এবং কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থাবর সম্পত্তি, অর্থাৎ পার্টি অফিসগুলি— আইন অনুযায়ী তার মালিকানাও তো তাহলে ব্যক্তিগতভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস দলটির হাতে কী রইল? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কখনো রাজনীতি থেকে বিদায় নেন এবং মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বেচে দেবেন— তাহলে যে নেতা-কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ওঠবোস করছেন— কী হবে তাঁদের? এই দলটিরই বা কী হবে?

সমগ্র বিষয়টিই খুব রহস্যজনক। একজন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তি মালিকানায় সবকিছুকে কুক্ষিগত করে রাখাটাই তো সন্দেহজনক। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁরই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বাজনদাররা গায়ের জোরে অনেককিছুই অস্বীকার করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তাতে সত্য আড়াল করা যায় না। সত্য যা তা একদিন প্রকাশিত হবেই।

জনপ্রিয়তা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু তার থেকেও কঠিন জনপ্রিয়তা ধরে রাখা। ভাবমূর্তি নিয়ে একবার যদি প্রশ্ন উঠতে শুরু করে— তাহলে জনপ্রিয়তার পারদ চড়চড় করে নীচে নামতে বাধ্য। সরকারে আসার মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর সারদা, নারদ, রোজভ্যালির তিরে বিদ্ধ হয়েছেন মমতা। এবার তাঁরই একদা রাজনৈতিক সতীর্থ মুকুল রায় বাণ হেনেছেন। ১০ নভেম্বরের সভায় মুকুল আরও বলেছেন, দ্বিতীয় দফায় আরও তথ্য ফাঁস করবেন তিনি। যে তথ্যই ফাঁস করুন, বোঝাই যাচ্ছে, মূল লক্ষ্য মমতা। শেষ পর্যন্ত রং চটে গিয়ে খড়ের কাঠামোটি বেরিয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন সততার প্রতীক? ■

এই সময়

লাইনে রাহুল

গোড়ায় বোঝা যায়নি। পরে ব্যাপারটা জানাজানি হতে হৈচৈ শুরু। বেঙ্গালুরুতে শিশুদের জন্য আয়োজিত একটি বিজ্ঞান

প্রদর্শনীতে রাহুল দ্রাবিড়কে দেখা গেল বাচ্চাদের নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। সেলেবজনিত উন্নাসিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। এই ঘটনায় নেটিজেনরা উচ্ছ্বসিত।

ক্যানসারের অ্যানসার

কানাডার ডায়ানে বিশপ খারাপ ধরনের স্তন ক্যানসারে ভুগছিলেন। ডাক্তারবাবুরা কোনও আশাই তাকে দিতে পারেননি। এই অবস্থায় দুটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। লটারির টিকিট

কেটে তিনি ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পেয়েছেন এবং বহুদিন পর তার শরীর চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। ডায়ানে বলেছেন ঈশ্বর না চাইলে এরকম হতে পারে না।

যখন কেউ নেই

কর্ণাটকের বেলগাঁও শহরে রাতবিরেতে অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন হলে মঞ্জুনাথ

নিনগাপ্পা পূজারির ডাক পড়ে। পেশায় অটো ড্রাইভার মঞ্জুনাথের অটোটি অ্যাম্বুলেন্স হয়ে যায়। গরিব মানুষের জন্যে সন্ধ্যে ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তাঁর এই ফ্রি সার্ভিস।

সমাবেশ -সমাচার

কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রের উদ্যোগে ফল চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২২ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা (ব্যারাকপুর) জেলার কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে এলাকার সম্পন্ন কৃষকদের ফল চাষের বিশয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। তৎসহ কৃষকদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ফলের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় সেবা কেন্দ্রের কর্ণমাধবপুর শাখার নিজস্ব অঙ্গনে। আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল ফল চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে আসেন কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক।

এদিন শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন বিভাগীয় আধিকারিক, সর্ব ভারতীয় সমন্নিত ফল গবেষণা কেন্দ্রের বিশিষ্ট উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ববিদ ড. দিলীপ কুমার মিশ্র, উদ্যানবিদ ড. ফটিক কুমার বাউরি, উদ্যানবিদ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ ড. সাহার মুর্মু প্রমুখ। শিবিরে প্রশিক্ষকগণ আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে কম সময়ে অধিক ফল উৎপাদন করা সম্ভব সে বিষয়ে কৃষকদের অবহিত করেন। নিত্য নতুন জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, কীটনাশক, রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সারের ব্যবহার করার বিষয়েও আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এদিন শিবিরে উপস্থিত কৃষকদের বিনামূল্যে প্রত্যেককে একটি করে কলা, বেল ও আমের চারা দেওয়া হয়। এগুলি সবই উন্নত ফলনশীল চারা। এই জাতীয় ফলের চাষ করতে গিয়ে কী কী জীবাণুর আক্রমণ ঘটে, তা প্রতিরোধ করতে কোন জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়। এদিন কর্ণমাধবপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের সম্পন্ন কৃষকদেরই মূলত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বন্ডিপুর, নিমতা, শিউলি গ্রামের চাষিরা এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র এ-জাতীয় সেবামূলক কাজ দীর্ঘদিন ধরেই করে চলেছে।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের উদ্যোগে বিজ্ঞান কর্মশালা

গত ৪, ৫ নভেম্বর হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে বিজ্ঞান কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ২০টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক

এই সময়

থানায় মালাবদল

পরিবারের কিছু লোক ঝামেলা করেছিল। তাই বিয়ে মাঝপথে থামিয়ে কনৌজের দুই

যুবক-যুবতী থানায় গিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। সেসব হয়ে যাবার পর থানাতেই তাঁরা মালাবদল করেছেন। আপাতত নবদম্পতি নিজেদের বাড়িতে।

সমুদ্রের কাছে

এক মৃত্যুপথযাত্রিনী রোগীর শেষ ইচ্ছে, একবার সমুদ্র দেখবেন। ফেরাতে পারেননি

অ্যাম্বুলেন্স চালক। সমুদ্র দেখে রোগিনীর চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু কিন্তু অমলিন হাসিটুকু মুখে লেগে রইল। ঘটনাটি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের।

টাকা খাওয়াতে গিয়ে

হোক সার্কাসের খাঁচায় বন্দি বাঘ, তবু বাঘ তো! তাকে নোটের তাড়া খাওয়াতে গিয়ে

বিপদে পড়েছেন চীনের হেনান প্রদেশের এক প্রৌঢ়। বাঘটি তিন মিনিট ধরে তার হাত কামড়ে ধরে রেখেছিল। অনেক সাধ্যসাধনার পর বাঘবাবাজি শিকার ছাড়তে রাজি হয়। প্রৌঢ় আপাতত হাসপাতালে।

স্তরের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রথম দিন পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় দিন নবম, দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রথমদিন বিজ্ঞান কর্মশালার উদ্বোধন করেন হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশনের পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক ড. রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় দিন দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিশনের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ। তাঁরা প্রত্যেকেই যুগপোযোগী অডিয়ো- ভিডিয়োর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের সামনে ব্যাখ্যা করেন।

এই বিজ্ঞান-কর্মশালায় বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের মোট ১২ জন অধ্যাপক এবং শিক্ষক বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতি ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সীমা জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ১২ নভেম্বর সীমা জাগরণ মঞ্চের কলকাতা মহানগরের কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে। সম্মেলনে প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান, এয়ারফোর্সের প্রাক্তন জওয়ান, ব্যবসায়ী এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীমা জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক জগন্নাথ সেনাপতি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সিআইএস আর আধিকারিক কে কে গোস্বামী, কর্নেল দীপক ভট্টাচার্য, সি আর বণিক প্রমুখ। সম্মেলনে ১০৩ জন পুরুষ ও ২৪ জন মহিলা কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

মানবী মা

হরিণ শাবকটি অনাথ। তাই বলে ভারতবর্ষে তার জননীর অভাব হবে কেন! সম্প্রতি

রাজস্থানে বিশোনি সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে অনাথ হরিণ শাবককে স্তন্যপান করাতে দেখা গেছে। এই মা জানিয়েছেন, অনাথ এবং জখম হরিণ শাবকদের তিনি প্রায়ই স্তন্যপান করান।

দহনসুখ

ফ্রান্সে এক ব্যক্তির শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না।

কিন্তু তারই যমজ ভাইয়ের ত্বক ট্রান্সপ্লান্ট করে রোগীকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন চিকিৎসকেরা। এত জটিল স্কিন ট্রান্সপ্লান্টেশন বিশ্বে এই প্রথম।

ঘুমঘোরে

চোর জানলা ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছিল চুরি করতে। কিন্তু ফ্রিজ খুলে খাওয়া-দাওয়া সেরে

সে ঘুমিয়ে পড়ল। পরেরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন তার হাতে হাতকড়া। চারদিকে গাদাগুচ্ছের পুলিশ। ঘটনাটি স্কটল্যান্ডের। চোর বাবাজি আপাতত হাজতে।

উপভোক্তারা ওষুধের আসল দাম জানতে পারবে

কেন্দ্রীয় মেডিসিন ইনডেক্স কন্ট্রোল বোর্ড, 'ড্রাগস্ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট ৯৬-এর সংশোধনের প্রস্তাব রেখেছে। এই প্রস্তাবে ওষুধ নির্মাতা কোম্পানি-গুলিকে ওষুধের প্যাকেটের ওপর খুচরো মূল্যের (এম আর পি) সঙ্গে উৎপাদন মূল্য লিখতে হবে। এর ফলে উপভোক্তারা জানতে পারবেন ওষুধের প্রকৃত দাম এবং কোম্পানি এর ওপর কত লাভ করছে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ওষুধের প্যাকেটের ওপর ল্যান্ডেড প্রাইস অর্থাৎ ভারতে আসা পর্যন্ত কত খরচ হয়েছে লিখতে হবে। অধিনিয়ম-৯৬ অনুযায়ী বর্তমানে কোম্পানির প্যাকেটে সমস্ত করের সঙ্গে এম আর পি লিখতে হবে। এতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় কোম্পানিগুলি লিখত না।

ব্যাঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে এন্ট্রি আধারকার্ডে

দেশের মধ্যে ব্যাঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে প্রথম এন্ট্রিকার্ড হিসেবে আধার লাগু হতে চলেছে। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি যাত্রীদের এন্ট্রি হবে এবং বোর্ডিং পাশও পাওয়া

যাবে। আর অন্য কোনো প্রকার ডকুমেন্টের প্রয়োজন হবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধার বেসড্ সিস্টেমের ফলে যাত্রীদের এন্ট্রি থেকে বোর্ডিং গেট পর্যন্ত পৌঁছতে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগবে। এখন এই প্রক্রিয়াটির জন্য আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে।

দেশে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সৌভাগ্য স্কিম

সারা দেশে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিনে 'সৌভাগ্য' স্কিম চালু করেছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদকে ট্রান্সফরমার, মিটার ও তারের জন্য ভরতুকি দেবে। এর জন্য কেন্দ্র সরকারের ১৭ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। সরকার প্রতিটি গ্রামে ২০১৯-এর মধ্যে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। কেন্দ্র সরকার দু'বছর আগে পাওয়ার ফর অল স্কিমের সূচনা করে দেশের সমস্ত গ্রামে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিদ্যুৎমন্ত্রকের দাবি, ৩০৪৬টি বসতিহীন গ্রাম বাদে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে।

মুডির চেয়ে বড় রেটিং আগামী মাসে গুজরাট ও হিমাচল থেকে আসবে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

১৮ ডিসেম্বর না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে, ততক্ষণ দেশের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা 'মুডির' মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্ক একটি দুরূহতম প্রশ্নের ওপর দোদুল্যমান থাকবে। তাহলো মুডির মূল্যায়নকেই কি মান্যতা দেওয়া হবে? প্রকারান্তরে যা প্রধানমন্ত্রী মোদীরই অনুসৃত অর্থনৈতিক লাইনের স্বীকৃতি নাকি তথাকথিত অর্থনীতিবিদ তথা প্রগাঢ় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আগাগোড়া নেতিবাচক লাইনকেই সঠিক বলে ধরতে হবে।

একথা কখনই বলা যায় না যে নির্বাচনী সাফল্য যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে নস্যাৎ করে দেওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্ত। কিন্তু মোদী সরকারের জনপ্রিয়তার বিচারে ভোটের ইতিবাচক ফলাফল অবশ্যই সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর সিলমোহর দেবে। অর্থনীতির তাবড় পণ্ডিতরা যারা মোদীর গৃহীত যাবতীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কট্টর বিরোধিতা করে আসছেন তাদের কথা ঠিক হলে গুজরাট এমন একটি রাজ্য যেখানে ব্যবসা বা ধান্দা (নিন্দার্থে নয়) করাটা গুজরাটবাসীর ডিএনএ-তে রয়েছে। সেখানকার ভোটদাতারা সর্বপ্রথম মোদীকে নিরাশ করবেন। এর মানে কিন্তু এই নয় যে ভারতীয় নির্বাচন সর্বদাই কেবলমাত্র জীবন জীবিকার নিরিখেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি মানদণ্ড বলে কোনো কিছুকে ধরতে হয় সেক্ষেত্রে গুজরাট নির্বাচনে বিজেপির জয় আরও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা Pew Research Centre-এর তরফে করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষায় সারা ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই ৮০ শতাংশ নাগরিকের পছন্দের নেতা, যাঁর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি নিরাপদ ও উন্নয়নমুখী— এই বিশ্লেষণকেই পুরোপুরি সমর্থন করবে।

আজকের এই চূড়ান্ত মিডিয়া চালিত প্রচার ও যে কোনো বাস্তব ঘটনার ওপরই নিজস্ব মতামত চাপিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রবণতার ফলে আসল ঘটনা যদি মানুষের অজ্ঞাতে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। যেমন অধিকাংশ বিরোধী সাংসদই নিঃসংশয় ছিলেন যে বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত মানুষের দরবারে চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে, ফলে সরকার পড়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। উত্তরপ্রদেশের ফলাফলের পর দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ হয়েছে যে বিরোধীরা সবচেয়ে বেশি গলা ফাটিয়ে বিমুদ্রীকরণের বিধ্বংসী ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে বোঝাচ্ছিলেন তাঁরা আর যাই হোন সাধারণ মানুষের চিন্তার কোনো নাগালই পাননি। তাঁদের চিৎকার কখনই জনতার ভাবনার প্রতিফলন ছিল না। জনতার ভাবনা-চিন্তার হদিশ পেতে গেলে যেসব লোক প্রতিবাদে গলা ফাটাচ্ছে না তাদের বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

এ প্রসঙ্গে দেশের বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোহন্ত আদিত্যনাথের অভিষেকের পরই কিন্তু মোদীর দেশের অর্থনীতি পরিচালনা শেষ হয়ে যায়নি। উল্টে জিএসটি লাগু হওয়ার পর গুজরাট নির্বাচন এসে পড়ায় তা আবার একই পরীক্ষার মুখে পড়েছে। জিএসটি-র মধ্যে এমন অনেক কিছুই নতুন করে এসেছে যাতে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা অন্যান্য মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই কর ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর সঠিকভাবে পূরণ করে বা বেশ কয়েক দফা রিটার্ন ফাইল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতা শুধু নয় কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশও রয়েছে। কিন্তু একথাটাও সত্যি জিএসটি লাগু হওয়াতে সবচেয়ে অসুবিধে তাদেরই হচ্ছে যারা ব্যবসার বাজারে টিকে থাকতে পুরোপুরি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে চলাটাই ব্যবসার অঙ্গ করে ফেলেছিলেন।

এই শ্রেণীভুক্তরাই বিমুদ্রীকরণের সময় একবার নাকখত দিয়েছেন। তাঁরাই জিএসটি-র জটিলতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি শোরগোল করে নতুন কর ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে

"এই শ্রেণীভুক্তরাই বিমুদ্রীকরণের সময় একবার নাকখত দিয়েছেন তাঁরাই জিএসটি-র জটিলতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি শোরগোল করে নতুন কর ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে সদা তৎপর। এক্ষেত্রে এমনটা নয় যে কংগ্রেস ও অন্যান্য কিছু বিরোধী দল এটা জানে না যে জিএসটি-র এই ভয়ঙ্কর বিরোধীরা একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে যাতে এক পয়সাও কর দিতে না হয়।"

ফঃ ৪

দিতে সদা তৎপর। এক্ষেত্রে এমনটা নয় যে কংগ্রেস ও অন্যান্য কিছু বিরোধী দল এটা জানে না যে জিএসটি-র এই ভয়ঙ্কর বিরোধীরা একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে যাতে এক পয়সাও কর দিতে না হয়। কিন্তু হায়! রাজনীতিতে অনেক সময়ই জেনেশুনে আদর্শের পথ ভুলে যেতে হয়।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি জায়গায় যেমন রাজকোট ও সুরাটে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখেই বিক্ষোভ পরিচালিত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু চাকরি খোয়ানোর বিষয়টিও রয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস এখনও পরিষ্কার নয় জিএসটি-বিরোধিতায় সামাজিকভাবে কারা কারা দলবদ্ধ হয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডেকে বহু বিষয়ে সরকারের তরফে বাধ্যতামূলক জমা দেওয়ার সময়ে পরিবর্তন ঘটানো, বহু দ্রব্যের কর হারে প্রয়োজনীয় হ্রাস করা এটাই প্রমাণ করে যে বিক্ষোভকারীদের অনেক দাবিই ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু জিএসটি বিরোধিতার আড়ালে আদতে মোদীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই এক চরম হতাশাজনিত বিরক্তি কাজ করছে না তো? হঠাৎ করে কোনো হই-হল্লা বাঁধিয়ে অস্থিরতা তৈরিই কি উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নগুলিরই যথাযথ উত্তর দিতে পারে গুজরাটের নির্বাচনী ফলাফল। সেটি চিরস্থায়ী উত্তর না হলেও অন্তত আগামী নির্বাচনের সময় পর্যন্ত এই হল্লা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।

রাজনীতিতে নির্বাচনী পরীক্ষার গুরুত্বকে কখনই খাটো করে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে উপর্যুপরি নির্বাচিত সরকারগুলি অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী কাঠামোগত পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে। এর মূল কারণ দুটি।

প্রথমত, সংঘাতের রাস্তায় গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক কিছু অসুবিধে সৃষ্টি হবেই। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিনের স্থিতাবস্থায় বিচ্যুতি ঘটে যেতে পারে যতই তা সাময়িক হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সরকারেরই অর্থনীতিতে এই ধরনের মূলগত পরিবর্তন আনতে গেলে তার যে তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাকে সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত আত্মবিশ্বাসই ছিল না। এই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু গড়পড়তা রাজনীতিকদের থেকে ভিন্ন ঘরানার। লোকসভায় তাঁর দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এটাই তার একমাত্র কারণ নয়। তার আসল কারণ তিনি দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁর বক্তব্য সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয় কুশলতার অধিকারী। তাঁর সব থেকে বড় সুবিধে হচ্ছে মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সেই সুবাদে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে তাদের বুঝতে বাধ্য করা। এত বড় কাজটা সম্ভব হওয়ার মূল কারণ খুবই সহজ, দেশের মানুষ তাঁর কোনো কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো অন্তর্নিহিত সন্দেহ পোষণ করে না। তাঁর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও গৌরবকে পরিপূর্ণতা দেয় তাঁর সদর্থক নৈতিক অবস্থান। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বছর পর মূল্যায়ন সংস্থা মুডি প্রদত্ত আপগ্রেডেশন থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে ভারতে সমান্তরালভাবে দুটি থিয়োরি চলছে। প্রথমটি হলো মোদীর অনুসৃত সবরকমের বড়সড় সংস্কারের পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি কাজ করছে— বিশেষ করে বিমুদ্রীকরণের বোমা ফাটার সময় এমনটা ভয়ঙ্করভাবে অনুভূত হয়েছিল। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী মোদী একজন সর্বাংশে দুঃসাহসিক নেতা যিনি অনায়াসে সদা সাবধানতা বা তাঁর কথায়— 'চলতা হ্যায়'-এর মতো নিরাপদ পথে চলার লোক নন। এই 'চলতা হ্যায়'-এর মতো গয়ংগচ্ছতাই দীর্ঘদিন বাহির বিশ্বে ভারতের পরিচয় মলিন করে রেখেছিল।

এখন যে কেউ যে কোনো মতাবলম্বী বা অনুসরণকারী হতে পারে, তবে আজকের ভারতের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কোন পথে চলবে তার স্বচ্ছ বিকল্প এতদিন পরে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, রাজনীতির দোহাই দিয়ে অর্থনীতিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখার দিন শেষ। ■

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে।

এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-তদন্তের দাবি উঠুক

পশ্চিমবঙ্গের জনক, বাংলার হিন্দুদের হৃদয় সম্রাট, আদ্যোপান্ত নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ জাতীয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত হওয়া উচিত। কেননা মুসলিম লিগের দাবির কাছে মাউন্টব্যাটেন, জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিমুখী নেতিবাচক সিদ্ধান্তের ফলে দেশভাগ হয় এবং সমগ্র বাংলা এবং পঞ্জাব মহম্মদ আলি জিন্নার হাতের মুঠোয় চলে যায়। সেখান থেকে শ্যামাপ্রসাদ পূর্ব পঞ্জাব এবং পশ্চিমবাংলা নামক ভূখণ্ড দুটি জিন্নার হাত থেকে থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে দুই রাজ্যের হিন্দুদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে গেছেন। আবার নেহরুর রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতার কারণে কাশ্মীরকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য সেখানে গিয়ে প্রাণ বলিদান করেছেন।

দেশভাগের জন্য জিন্নার যুক্তি ছিল— যে সমস্ত প্রদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই প্রদেশগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। শ্যামাপ্রসাদ ঠিক সেই একই যুক্তি তুলে ধরে দাবি করেছিলেন— ওই সমস্ত প্রদেশের মধ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। তাঁর এই দাবি মাউন্টব্যাটেন মেনে নিয়ে পূর্ব পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠন করেছিলেন। সে কারণে শ্যামাপ্রসাদ গর্বভরে বলেছিলেন— 'জিন্না ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।' তাঁর এই চালে দিশাহারা হয়ে জিন্না ইংরেজ প্রভুদের পায়ে ধরে মিনতি জানিয়েছিলেন— দয়া করে আমাকে পোকাকাটা পাকিস্তান দেবেন না।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর শ্যামাপ্রসাদ জননী যোগমায়া দেবী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখে সন্তানের মৃত্যু-তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু নেহরু তাতে কর্ণপাত করেননি।

১৯৬৯ সালে অপূর্ব সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত (যুগান্তর) নামে দুই প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীনগরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শেখ আবদুল্লা তখন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। কলকাতার সাংবাদিক শুনে তিনি বলেছিলেন— 'আপনাদের ধারণা যে আমি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আমি হত্যাকারী নই। 'কিলার' আরেকজন।' শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয় তা তিনি 'কিলার' শব্দ ব্যবহার করে মেনে নিয়েছেন। তাহলে হত্যাকারী কে? তা অবশ্য আবদুল্লা খোলসা করে বলেননি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার মতো এক মুখে বিভিন্ন কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি সোজা কথাটি স্পষ্ট ভাষায় নির্ভয়ে বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না। তাই ব্রিটিশ,কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মুসলিম লিগ কোনো দলই তাঁকে সহ্য করতে পারত না। তার জন্যই কি তাঁকে কাশ্মীরে প্রাণ বলিদান দিতে হলো?

কোন্ শক্তিধর ব্যক্তির নির্দেশে শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র দেশবাসীর কাছ থেকে সেই তদন্তের দাবি উঠুক। উপরন্তু কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে শ্যামাপ্রসাদ হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করতে দাবি জানাক।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা,
নয়াপাড়া, গাজোল, মালদা।

উন্নয়নের ফল কারা ভোগ করবে?

পশ্চিমবাংলার রাস্তাগুলি আগে ভাঙাচোরা ছিল। রাস্তার আলোগুলিও কমজোর ছিল। এখন রাস্তাগুলির উন্নতি হয়েছে। সরকার এই উন্নয়নের জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন। জনগণও আহ্লাদিত। চারিদিকে উন্নয়নের ঢাক বাজছে। কিন্তু এই উন্নয়নের ফল পশ্চিমবঙ্গবাসী কতদিন ভোগ করতে পারবে সেটা আমরা ভেবে দেখেছি কি? কারণ আজ ধুলাগড়, পাঁচলা, কালিয়াচক, দেগঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় হিন্দুদের লাগাতার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ ইসলামিক বাংলা হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখানে অতঃপর হিন্দুদের বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ মুসলমানেরা যখনই কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেখানে তারা মুসলমান ছাড়া আর কারও উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। সেখান থেকে অ-মুসলমানদের মেরে তাড়ানো হয়। আর এভাবেই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ভয়াবহ অত্যাচার করে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে যে এখানেও তাই হতে চলেছে। এরকম হলে উন্নয়নের সুফল কতদিন ভোগ করা যাবে! নির্বোধ বাঙালি হিন্দুরা এই সোজা কথাটি বুঝতে পারছে না।

আমি একজন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালি হিন্দু। আমার আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহে। দেশভাগজনিত বিপদের কারণে আমরা সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিলাম। আজ সেখানেও যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তাঘাট যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটাটি আজ বিধর্মী মুসলমানদের দখলে। তাহলে ওই উন্নয়নের ফল কে বা কারা আজ ভোগ করছে?

অনুরূপভাবে আমাদের আজ ভাববার সময় এসেছে যে এই যে উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ চলছে, এর ফল অতঃপর কারা ভোগ করবে? হিন্দুদের কবে দূরদৃষ্টি হবে?

—দিলীপ কুমার পাল,
শ্রীরামপুর, উত্তর গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

উঠে দাঁড়ালেন না কেবল গান্ধী

'তৃণমূলী' সাংসদ সুগত বসু কোনো এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে, বলেছেন— 'আজ যাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে ঢাক পেটান, তাঁদের থেকে নিজেকে আলাদা করেছি, কারণ আমার জাতীয়তাবাদ আমি শিখেছি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময়ে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত একটি প্রার্থনাসভা হয়েছিল। তখনও 'জনগণমন' জাতীয় সংগীত হয়নি, মঞ্চে 'বন্দে মাতরম্' গানটি হওয়ার সময়ে সকলে উঠে দাঁড়ালেন, বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিও দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন না কেবল গান্ধী। বললেন, ওটা একটা পাশ্চাত্য প্রথা, ভারতীয় সংস্কৃতিতে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা দেখানোর চল নেই।'

সুগত বসু পণ্ডিত ব্যক্তি। গল্পটির মাধ্যমে তিনি কী বলতে চেয়েছেন, তা আমাদের মতো আমপাঠকের বোধাতীত। 'বন্দে মাতরম্'-এ মুসলমানদের উগ্র বিরোধিতার বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি। তাই একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, 'বন্দে মাতরম্'-এ মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার কথা স্মরণ করেই গান্ধীজী উঠে দাঁড়াতে ভরসা পাননি। গান্ধীজীর সাফাই জবাব যদি মানতে হয়, তাহলে তো আমাদের কোনও 'জাতীয় সংগীত' থাকাই সঙ্গত নয়।

জানতে ইচ্ছে করে, সংসদে জাতীয় সংগীত হওয়ার সময়ে 'গান্ধী'র জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে পরিশীলিত সুগতবাবু বসে থাকেন না উঠে দাঁড়ান? পরিশেষে আর একটি কথা। 'বন্দে মাতরম্' গানের সময়ে সোহরাওয়ার্দি যে আর সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তার কারণ, কলকাতার তখনকার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর হোতাকে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

ভারতের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ভারতের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। এইরকম দেশনায়ক দরকার ছিল ভারতের। ক্রমশই মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছিল সাধারণ মানুষের। মেরুদণ্ডহীন সরকার আমরা দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ষাট বছর ধরে। অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই সময়কাল ছিল খুবই অল্প মাত্র পাঁচ বছর। তিনি এই পাঁচ বছরে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছিলেন যেমন, অফিস আদালতে ডিসিপ্লিন, সড়ক যোজনা, অন্ত্যোদয় যোজনা এছাড়াও আরও অনেক কিছু। বাজপেয়ীজী যে বীজ ভারতবর্ষের মাটিতে রোপণ করেছিলেন, মোদীজীর হাত ধরে তা এখন বৃক্ষের আকার ধারণ করেছে। ফুল ফুটছে, আগামীদিনে ফুল থেকে ফল হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। মোদীজীর এই আড়াই বছরে চালু করা জনধন যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, জহর রোজগার যোজনা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পুরোনো নোট বাতিল ও নতুন নোট বাজারে চালু করা অর্থাৎ কালোটাকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক।

এই নোটবন্দি নিয়ে মোদীকে বন্দি করতে চেয়েছিল বিরোধীরা। লাল, সবুজ, নীল পার্টি মিলেমিশে একজোট হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। নরেন্দ্র মোদীকে এক্ষুনি পদত্যাগ করতে হবে, ব্যাঙ্কে দীর্ঘক্ষণ লাইন, মানুষ হয়রান হচ্ছে, রাস্তায় নেমে অসভ্যতা বর্বরতা, সংসদ অচল করা। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ খুবই বিচক্ষণ। তারা ভালো মন্দ বোঝেন তাই তো উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মণিপুরে বিপুলভাবে ভোটে জিতে সরকার গড়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। অপপ্রচার করে মানুষকে ভুল বোঝানোর ফল হাতেনাতে পেয়ে গেল অখিলেশ, রাহুল, মায়াবতী আর কেজরিওয়ালরা। গতি তো টলানো গেলই না, উল্টে আরও দশ বছরের জন্য মোদীজীর ভিত মজবুত হলো। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে আগামীদিনে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যেই পদ্মফুল ফুটবে।

—**গৌতম ব্যানার্জী,**
ডানকুনি, হুগলি।

পুরুলিয়া নামের উৎস

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে পুরুলিয়া জেলা। এই জেলায় কংসাবতী নদীতটে রয়েছে জেলা সদর পুরুলিয়া। প্রচলিত মতানুযায়ী দ্রাবিড় ভাষা পেরুল শব্দের অর্থ নদী বা জল, পারু শব্দের অর্থ নুড়ি বা পাথরের চাঁই। কলাবা ওলা শব্দের অর্থ হচ্ছে মধ্যে বা মাঝখানে। সুতরাং পুরুলিয়া বা পেরুল্লা বা পেরুল্যের অর্থ পাথুরে ডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম। যাই হোক, বিষয়টি অন্যভাবে বিচার করা যাক।

প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে বর্তমান বৃহত্তর পুরুলিয়া অঞ্চলকে বজ্রভূমি বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি। বর্তমান ভূগোল অনুযায়ী এই অঞ্চলের মাটিতে পাথর ও কাঁকড় মিশে থাকার জন্য মাটির গঠন স্থূল বা পুরু। এ অবস্থায় প্রথমে পুরু শব্দের অনুকরণে বৃহত্তর অঞ্চলের নাম হয় পুরুল বা পুরুলিয়া। এক সময় অঞ্চল নামের অনুকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ লোকালয়ের নাম হয় পুরুলিয়া। যেমন— কলিঙ্গ ও পুন্ড্র অঞ্চলে বা দেশনামের অনুকরণে কলিঙ্গনগর ও পুন্ড্রনগর লোকালয় বা জনপদ নাম হয়েছে।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

গ্রাম-বাংলাকে মুখরিত করে তোলে নবান্ন উৎসব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

নতুন শালিধান, নতুন অন্নকে কেন্দ্র করে গ্রাম-বাংলার যে সর্বজনীন উৎসব, তাই নবান্ন। ধরণীর উপহারে 'ঋতুর খাঞ্চা' তখন ভরে ওঠে, নবীন ধানের আঘ্রাণে মাত হয় অঘ্রাণ; মাঠে মাঠে আমন ধান পেকে ওঠার সোনালি শোভা। 'গোবিন্দ ভোগ' চালের পায়েস-পরমান্নের সুবাসে আর 'গিন্নী পাগল' চালের ফিরনির ভুরভুরে গন্ধে; বিশ্বাস-সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়াত চিন্তন-পরিমণ্ডলে এ এক অনবদ্য অনুষ্ঠান; আর তাতে পুরোটাই 'মাটির গন্ধ'। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নবান্ন' আর কাজী নজরুলের 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় তার অনবদ্য আঘ্রাণ।

নতুন ধান মুখে তোলার আগে ইস্ট দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হবে। নবীন ধানের ছড়ায় নানান অলঙ্কার বানিয়ে কৃষক তার বাড়ির দরজা অলঙ্করণ করবে। কৃষকবাড়ির উঠোন, মরাই তার জীর্ণতা দূরে সরিয়ে হয়ে উঠবে নান্দনিক। ধান্যলক্ষ্মী ঘরে আসছে ডালাভরা পাকা ফসল নিয়ে। 'লেপিয়া আঙিনা দ্যায় আলপনা ভরা মরাই-এর পাশে,/ লক্ষ্মী বোধহয় বাণিজ্য ত্যাজি এবার নিবসে চাষে।'

অঘ্রাণ মাস নতুন ফসলের বার্তা বয়ে আনে, নতুন আশা; নতুন করে জীবনের জয়গান গেয়ে ওঠেন পল্লীকবি। তখন কৃষকের গোলায় ধান আর গলায় গান— 'প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নয়া হেউতি ধান। কেউ কাটে কেউ ঝাড়ে কেহ করে

নবান।' আনন্দ এ কারণেই, 'নবান্ন' মানে খাদ্যের নিরাপত্তা। অন্নের ভাণ্ডার তখন পূর্ণ; দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানের পরও জলপানের আনন্দ। নিরন্নের অন্নস্বপ্নের তখন যথার্থ লগ্ন। ক্ষুধার্তের কাছে তখন অন্নই দেবী লক্ষ্মীরূপে, অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা রূপে প্রকৃত আরাধ্যা, দয়াময়ী মাতৃরূপা। বাংলার প্রাণলীলার সকল ভিত্তি এই অঘ্রাণ, এই নবান্ন— 'ওরে অগ্‌গেরান মাসেতে দ্যাশে জরসে নতুন ধান। ওরে চিড়ামুড়ি দিয়া লোকে করেনও জলপান।'

কিন্তু এমন আনন্দঘন দিবসেও বিরহী রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ যে আর আসবেন না। লোককবি তাই আনন্দের মাঝেও বিরহিণী রাধার দুখের বারোমাস্যার কথা বিস্মৃত হন না, 'অঘ্রায়ণে নবান্ন হয় ঘরে ঘরে। আমার কুঞ্জে নাই যে কৃষ্ণ অন্ন দিব কারে?'

নবান্ন উৎসব আসলে ধান্যলক্ষ্মীর আরাধনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেবতা উপন্যাসে লিখছেন, "...কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে, এইবার লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারি করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।" ধান্যলক্ষ্মী বলেই তাঁর ধানের খোসার মতো গায়ের রং হলদে। লক্ষ্মীর মতো পশ্চিম সীমান্ত বাংলার টুসু মূর্তির রং হলদে, মাথায় মুকুট, দুই হাতে দুটি পদ্ম, সারা অঙ্গে নানা রকম গহনা।

কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'কমলামঙ্গল' কাব্যে দেবী লক্ষ্মীর আবরণ ও আভরণ হচ্ছে অজস্র রকমের ধান। কোনোটি দেবীর পায়ের আলতা, কোনোটি পাসুলি, কোনোটি আবার গলার সাতনরি হার। দেবীর চুলের অলঙ্কার, সিঁথি থেকে পায়ের নুপূর সর্বত্রই ধানের অপরূপ ব্যবহার।

''পদাঙ্গে লক্ষ্মীর অঙ্গে আলতা পরিধানে।
কিরণ দেখিতে যেন আলতা সমানে।।
তবে তো কণকচূড় পরিলেন পাসুলি।
নুপূর গরুড়ধান্য সীতাভোগগুলি।।
বাঁকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে।
কিঙ্কিণী জামাইনাড়ু আর পদ্মদলে।।
খইহার ধান্যের মালা পরিল গলায়।
দেসুতি শীতলজিরে হরিভোগ তায়।।
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।
ঊরুর উপরে পরেন বড় শোভা তার।।
সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।
নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল করিল।।
মুক্তাশাল সিঁথায় সিন্দুর শোভা পায়।
করবী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।।
লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোঁপায় রাখিল।
মুক্তঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল।।''

'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মেক্সিকোয় ফসল ঘরে তোলার মুখে ভুট্টার ছড় দিয়ে তারা গড়ে 'ছড়া-মা' মূর্তি। কীভাবে জগৎ পারাপার করে বাঙালিও তাদের ধানের দেবীকে ধান্য-অলঙ্কারেই সজ্জিত করেন। লক্ষ্মী-সাধনার এ এক বিশ্বরূপ।

বরিশালের একটি ছড়ায় পাই— 'কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন/ শুভ নবান্ন খাবা/কাক বলি লবা/ পাতি কাউয়া লাহি খায়,/দাঁড় কাউয়া কলা খায়, /কো কো কো, মোরগো বাড়ি শুভ নবান্ন।' নবান্নের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রাম-বাংলার যৌথ-সংস্কৃতির হারানো যোগসূত্র। নবান্নের সুস্বাদ পঞ্চভূতে উৎসর্গিত হয়, নিবেদিত হয় আদি পুরুষ, সত্যযুগের মুনি-ঋষি এবং পূর্বপুরুষদের। পরিবেশিত হয় গৃহের অতিথি নর-নারায়ণকে। খাওয়ানো হয় গাই-বলদ, প্রকৃতির নানান জীবজন্তু— ঝোপের শেয়াল, গাছের পাখি, পুকুরের মাছ, গর্তের ইঁদুর, পিপড়ে, পোকা-মাকড়কে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের দেবতা, বাস্তুতন্ত্রের জীবকুলকে খাইয়ে গৃহের আবাসিকেরা নবান্নের স্বাদ পান। আদতে দেবতা-পূর্বপুরুষের ভাগ ভাগাভাগি করে তো বন্যেরাই পায়। এ যেন ধান্য-সম্পদ রূপে পৃথিবীর ক্ষুধা-নিবৃত্তি। স্বর্ণাবরণ তূষের অভ্যন্তরে শস্যের শ্বেত-শান্তির মহান পূজা। গ্রাম-বাংলা নবান্ন কেন একেলা ভোগ করে না, কেনই বা থরে থরে সাজিয়ে তা প্রকৃতি মাতাকে উৎসর্গ করে, তার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'নবান্ন' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, ''...যেখানে উৎসর্গ নাই, দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন নাই, সেখানে অনিবার্য অতৃপ্তি, জ্বালাময় ভোগ-লালসা। নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবেশীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলকে অর্পণ করি। কেন? না করিলে আমি পশু হইয়া যাইব। ...আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা।''

রাঢ় বঙ্গের কোনো কোনো স্থানে যেমন কাটোয়া মহকুমার নবান্ন উৎসবে কার্তিক পুজো হয়। এই কার্তিক 'নবান্নে কার্তিক'। আসলে কার্তিকও কৃষি দেবতা। কৃষি-অরণ্য-পরিবেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে মা-দুর্গা ও তাঁর সন্তানদের। পরিচিতির আড়ালেও রয়েছে তাঁদের অন্যতর পরিচয়। সৌরদেবতা কার্তিক যুক্ত হয়েছেন উর্বরতাবাদের সঙ্গে। কার্তিক-ঊষার পুরাণ-কাহিনিও তাকে মান্যতা দিয়েছে। ঊষার শস্যক্ষেত্রে চির-অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কাহিনিতে রয়েছে সৌরশক্তি শস্যক্ষেত্রের উদ্ভিদদেহে ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ সবুজ কলায় শোষিত হবার ইঙ্গিত। কার্তিক যে উর্বরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার অন্য একটি প্রমাণ হচ্ছে, এই পূজায় ব্যবহার হয় 'অ্যাডোনিস গার্ডেন'-এর অনুরূপে চারাগাছপূর্ণ সরা। তাতে কার্তিকের প্রতীকরূপে পূর্জিত হয় গঙ্গামাটিতে অঙ্কুরিত ধান, ছোলা, মটর, কচু ও শুসনিশাক। উত্তরবঙ্গে কার্তিক সংক্রান্তিতে সারারাত ধরে যে গান ব্রতিনীরা পরিবেশন করেন তা বিষয় হলো ফসলের কীটশত্রু, জীবজন্তু তাড়িয়ে দেবার কাহিনি। তাই মনে করা যেতে পারে, শস্য-রক্ষাকর্তা দেবতাকে তুষ্ট করে শস্য ঘরে তোলার জন্যই কাটোয়াতে 'নবান্নে কার্তিক' পূজিত হন।

কোথাও কোথাও নবান্ন উৎসব 'চাল লবান' আর 'ভাত লবান'— এই দু'ভাবে পালিত হয়। চাল-লবানে এক আশ্চর্য খাদ্য প্রস্তুতি চলে আগের দিন রাত থেকে। নতুন আতপ চাল ভিজিয়ে পরদিন তা ঢেঁকিতে আধকুটো করে তাতে মেশানো হয় খেজুরগুড়, দুধ, খোয়াক্ষীর, মণ্ডা, নানান ফলের টুকরো আর আদার কুচি। অপূর্ব সুস্বাদু এই খাবারের নাম 'চাল-লবান' বা চাল-নবান্ন। ভাত-লবানে নতুন চালের ভাত তৈরির গল্প। পুরনো চালে নতুন চাল মিশিয়ে ভাত রাঁধা হয়। আর চাষির মেয়ে তা রাঁধতে রাঁধতে ছড়া কাটে— 'লয় পুরোনো শাড়ি চারি,/লয় পুরোনোয় বাকার বাঁদি,/নতুন রাঁদি পুরোনো খাই,/ এই করে যেন জীবন যায়। নতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন,/ এই যেন পাই জন্ম জন্ম।'

নবান্ন গ্রাম বাংলাকে মুখরিত করে তোলে। সকালে শিশু-বালক- বালিকার নানান লোকক্রীড়া; প্রবীণদের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা, সন্ধ্যায় কবিগান, ভাসান গান তাকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। আর তার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় 'বাসি নবান্ন';■তাতে আমিষের ঢালাও আয়োজন।

অমিত ঘোষ দস্তিদার

মনুস্মৃতি (২।১০) থেকে জানা যাচ্ছে যে— 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতি।' —'শ্রুতি' বলতে যেমন বেদকে বোঝায় তেমনি ধর্মশাস্ত্র বলতে বোঝায় 'স্মৃতি'কে। ধর্ম হলো সুপথ। ধর্ম মানুষকে পাশব প্রবৃত্তি থেকে নিয়ন্ত্রিত করে মঙ্গলমাধুর্য্য পথে নিয়ে আসে। ভারতবর্ষের সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রধানত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের বিভিন্ন স্তরে কর্তব্যসাধনা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে চরিত্র মহিমা গড়ে তোলাই ধর্মের প্রাথমিক সোপান। প্রাচীন ধর্মসূত্র প্রণেতারূপে গৌতম, বোধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, হারীত, শঙ্খ, লিখিত, বিখনস, পৈঠীনসী, উশনস, কশ্যপ এবং বৃহস্পতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাস্ক, আপস্ত তাঁদের নিরুক্তে মহাভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা রূপে মনুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি-সহ কুড়িজন ধর্মশাস্ত্র প্রণেতার নাম জানিয়েছেন।

ভারতের রাষ্ট্রনীতি ধর্মেরই একটি অঙ্গ। রাজধর্ম আবার সবরকম ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত। 'সর্বেধর্মা রাজধর্ম প্রধানাঃ'— 'মহাভারত' নামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটি আমাদের বোঝাতে চেয়েছে— সর্বধর্মের মধ্যে রাজধর্ম প্রধান ধর্মরূপে প্রতীয়মান। রাজনীতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ— 'অর্থশাস্ত্র'-এর প্রণেতা মহামতি কৌটিল্য। কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে আমরা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে কৌটিল্যের উল্লেখ পাই। যিনি বিষ্ণুগুপ্ত এবং চাণক্য নামেও পরিচিত। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীই চাণক্যের স্থিতিকাল।

অর্থশাস্ত্র—বিনয়াধিকারিক, অধ্যক্ষপ্রচার, ধর্মস্থায়ী, কণ্টকশোধন, যোগবৃত্ত, মণ্ডলযোনি, ষাড়্গুণ্য, ব্যসনাধিকারিক, অভিষাস্যৎকর্ম, সাংগ্রামিক, সঙ্ঘবৃত্ত, আবলীয়স, দুর্গলম্ভোপায়, ঔপনিষদ, তন্ত্রযুক্তি— এই পনেরোটি অধিকরণে বিভক্ত। যেখানে রাজ্যশাসনের নানা পুঙ্খানুপুঙ্খ সর্বদিক বিবেচনা করে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। ওই ১৫টি অধিকরণ আবার ১৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সমস্তদিক কৌটিল্যের নজরে ছিল; এবং কোনও ভাবেই কোনো একটি বিষয়ও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। সামগ্রিক ভাবে ওই সমস্ত বিষয়ের নীতিগুলিই অর্থশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশাসন নীতির বা রাজ্যশাসন পদ্ধতির এক প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ দলিল হলো অর্থশাস্ত্র।

কৌটিল্যের অসাধারণ বিবিধ শাস্ত্রপারঙ্গমতা ছিল। কৌটিল্যের পূর্বসূরিরা ছিলেন ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধ, পরাশর প্রমুখ অর্থশাস্ত্র প্রণেতাগণ। সর্বাগ্রে কৌটিল্য পূর্বাচার্যদের মত অনুধাবন করেছিলেন। তারপর সেই সকল শাস্ত্রের ভিত্তির উপর নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই কারণেই অর্থশাস্ত্রের সর্বাতিশায়ী ইমারত গোটা বিশ্বের কাছে আজও খুবই মজবুত। কৌটিল্য-পরবর্তীকালে কামন্দকির 'নীতিসার', সোমদেবের 'নীতিবাক্যামৃত', ধারাধিপতি ভোজ প্রণীত 'চাণক্যনীতি' প্রণেতাগণ এবং তাদের রচিত গ্রন্থ কৌটিল্যকে এবং তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'কে মান্যতা দিয়ে তাঁরা তাঁদের কর্মের গতি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নানা সময়ে নানাভাবে কৌটিল্যের অভিমত প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসনের সহায়ক হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকে কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'-এর অভিমত দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ করে গৌরবান্বিত করে তুলতে পেরেছিলেন। আধুনিক কালেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সমস্যা সমাধানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভারতীয় ভাবাদর্শ সবসময় আশার আলো দেখিয়ে দিতে পারে। যুগ যেমন নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজনীতিরও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের রূপান্তর ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসননীতি দেশে দেশে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির স্থায়িত্ব বজায় রেখেছে, এমন সমস্যাসঙ্কুলাবস্থায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতের অনুসৃত রাজধর্মই বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই গোটাবিশ্বে আজও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্যে হয়ে আছে। ▮

অঙ্গনা

নারী যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল

সুতপা চক্রবর্তী

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বোধহয় নারীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কথা ধরলে দেখা যায় জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী, নীপময়ী, কাদম্বরীদেবীরা নিজেদের স্বকীয়তা দিয়ে কখনও পোশাকে, কখনও আগুনঝরা কবিতা লেখায়, কখনও গানে অথবা নাটকে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ না থাকলে যেটা কখনও সম্ভব হতো না। যে সময়ে ওই ঠাকুরবাড়িতেই বর্ষীয়ান মহিলারা গঙ্গাস্নান সারছেন পাল্কি ডুবিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মৌলিকতা এবং ব্যক্তিত্ব দিয়েই অন্যরা নারী স্বাধীনতায় ব্রতী হয়েছেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যা আজও আপামর মহিলার কাছে অনুকরণযোগ্য উদাহরণ। ধীরে ধীরে সময় বদলেছে, বদলেছে ইতিহাস। সেই সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষাপট। আজকের নারীরা এতটাই সাবলীল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল যে সমাজের বা পরিবারের বেঁধে দেওয়া নিয়মনীতির বাইরে গিয়ে বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শিখছেন।

ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলো নারীর গুরুত্বকে সংরক্ষণের টানাপোড়েনে বরাবর স্থবির করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃন্দা কারাত, সুষমা স্বরাজ বা অম্বিকা চৌধুরির মতো দুঁদে মহিলারা সংসদে যখন গর্জে ওঠেন তখন তা যেন ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর নারীর কর্তৃত্বকেই জাহির করে। তবে আগামী দিনে হয়তো ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহিলারা কেবলমাত্র সংরক্ষণের জোরে জায়গা খুঁজবেন না, যোগ্যতা কর্মদক্ষতাই সেখানে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেবে।

নারীর চিরাচরিত অবস্থানক্ষেত্র তার ঘর— একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, অতিথি আপ্যায়ন, লোক-লৌকিকতা সবেতেই সংসারে নারীর কর্তৃত্ব সর্বজনবিদিত। বাড়ির পুরুষমানুষটি বাজার ফেরতা গৃহিণীর মতামতের বাইরে কিছু আনলে তার কী পরিণাম হতে পারে তা ভুক্তভোগী পুরুষ ছাড়া আর কে বলতে পারে? শুধু তাই নয়, সুগৃহিণীপনা দিয়ে সবার ইচ্ছে- অনিচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে সংসারে সমতা বজায় রাখা নারীর কর্তৃত্বের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংসারে নারীর শৌর্যবীর্যের কাহিনির শেষ নেই। নারী যেমন ভালবাসতে পারে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শামিল হয়ে সংসারে সমাজে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখে মাথা উঁচু করেও চলতে পারে সম্মানের সঙ্গে।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আজকের মহিলারা নিজেরাই ঠিক করেন কে কোন পেশাকে বেছে নেবেন। কোন পেশায় তারা কতটা স্বচ্ছন্দ, কতটা সাবলীল তা তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী স্থির করেন। আর সমাজও মনে হয় ধীরে ধীরে নারীর অবস্থানকে মর্যাদা দিতে শিখছে। আজকের মেয়েরাও পরিবার সমাজ থেকে মেয়ে হিসেবে নয়, মানুষের মতো ব্যবহার পেতে সচেষ্ট হয়েছে। এই চেষ্টাতেই পেশা নিয়ে অন্যরকমভাবে ভাবতে পেরেছিলেন কিরণ বেদি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম গভর্নর কেজি উদেসী যাঁরা নিজেদের পেশার ক্ষেত্রে শুধু যে সফল হয়েছিলেন তাই নয়, তাদের সাফল্য ও বিজয় গৌরবের কাহিনি আজও অন্যদের অন্যরকম কিছু ভাবার অনুপ্রেরণা দেয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মেয়েদের কর্তৃত্ব দেখার মতো। বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন ঝুলন গোস্বামী, তিরন্দাজ দোলা ব্যানার্জি, টেবিল টেনিসের পৌলমী ঘটক— প্রত্যেকেই অন্যধরনের কাজে নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে প্রমাণ করেছেন তাদের অনন্যতা। এভারেস্ট জয়ী মহিলা শত প্রতিকূলতার মধ্যে জিতেছেন। হ্যাঁ, বঙ্গতনয়া ছন্দা গায়েন এভারেস্ট শীর্ষে পা রেখেছেন। আত্মবিশ্বাস, স্বপ্ন, সাহস আর অধ্যবসায়ের এই যে জয় তাকে অভিবাদন করা ছাড়া উপায় থাকে না।

আজ কর্মক্ষেত্রে নারী উচ্চপদে আসীন। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, সমাজে সংসারে আজ তার প্রবল প্রতাপ। এই প্রবল প্রতাপান্বিত নারীকুলের প্রতি রইল অভিনন্দন। ▮

কলকাতার রাস্তায় নরপশুদের উল্লাস

বেদমোহন ঘোষ

বাংলার ইতিহাসে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ দিনটি অবিরাম রক্তক্ষরণের উৎসমুখ হিসেবে চিহ্নিত। এইদিন ধর্মের নামে, আল্লার নামে মুসলমানরা হাজার হাজার হিন্দু নরনারীকে হত্যা করেছিল। লুট হয়েছিল অসংখ্য বাড়ি। নিরীহ মানুষের মৃতদেহে ভরে গিয়েছিল কলকাতার রাজপথ। ইতিহাস এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে চিহ্নিত করেছে। লেখক শ্রীবেদমোহন ঘোষ সেই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। এই নিবন্ধে তিনি তাঁর নরক দেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। —স. স্ব।

মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশে মুসলিম লিগ কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে। তখন সারা বাংলায় মুসলিম লিগের সরকার। আর বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সুরাবর্দি। দিনটি সরকারি ছুটিরদিন ঘোষণা করেছিলেন সুরাবর্দি। ব্যবসা-বাণিজ্য, গাড়ি চলাচল সবকিছু বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছিল। তার কয়েকদিন আগে থেকেই মুসলিম লিগ ঘোষিত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ব্যাপারে প্রচারকার্য চলছিল। কিন্তু এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন কাদের বিরুদ্ধে এবং কীসের জন্য সেই তথ্য পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

কলকাতায় মুসলিম লিগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে যে নৃশংসতম ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে সংঘটিত হয়েছিল সেই সময়কার হিসাব অনুযায়ী কমপক্ষে কুড়ি হাজার নারী-শিশু-পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল (সূত্র : ছেচল্লিশের দাঙ্গা— জ্যোতি বসু) আর গুরুতর আহতের সংখ্যা ছিল এর চার গুণ। মুসলিম লিগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়ার মূল কারণ হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইতিহাসখ্যাত মুম্বইয়ে ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারির নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ব্যাপক বিদ্রোহ এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কারণে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় ভারতে ছিল দুটি সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দল। নিখিল ভারত কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লিগ। ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ঠিকই, কিন্তু কোন দল নেবে দেশ শাসনের দায়িত্বভার— কংগ্রেস না মুসলিম লিগ? মীমাংসার জন্য মিঃ এটলি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নেহরু ও বলদেব সিং এবং মুসলিম লিগের প্রতিনিধি হিসেবে জিন্না ও লিয়াকত আলি খানকে লন্ডনে আমন্ত্রণ জানালেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের এই নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে এটলির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন কিন্তু কোনও মীমাংসায় উপনীত হতে পারলেন না। ব্রিটিশ সরকারের অপর পরিকল্পনা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে দুই দলের সাহায্যে ফেডারেল সরকার গঠন'— সেই প্রস্তাবও বাতিল হয়ে গেল। কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া গেল না। মুসলিম লিগের দাবি উদ্দাম হয়ে উঠল। তাদের দাবি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য চাই পৃথক স্বাধীন মুসলিম হোমল্যান্ড— 'পাকিস্তান'।

কলকাতার রাজপথে পড়ে মৃতদেহ।

ওই সময় ছিল দেশের চূড়ান্ত টালমাটাল অবস্থা। একদিকে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। শুধুমাত্র দিনক্ষণের অপেক্ষা, অপরদিকে প্রশ্ন, দেশের শাসনভার কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে কীভাবে অর্পণ করা হবে? এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় আইনসভার অন্তবর্তী নির্বাচন হলো। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রীসভা গঠন করে। স্বভাবতই মুসলিম লিগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' দিনটিকে বাংলার বিশেষ করে কলকাতার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষরা ধরে নিয়েছিল এটি মুসলিম লিগের ইংরেজ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস মাত্র।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। স্কুলের ছাত্র। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল উত্তর কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত রাজাবাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে

পার্শিবাগানে। সার্কুলার রোডের কিছুটা অংশ এবং সম্পূর্ণ পার্শিবাগান রাস্তা আমাদের বাড়ির একতলা ছাদ থেকে দেখা যায়। ১৬ তারিখ ভোর থেকে রাস্তা জনশূন্য। গাড়ি চলাচল বন্ধ। সকাল থেকে সার্কুলার রোডে হাজার হাজার মুসলমান জমায়েত হতে লাগল। লাঠি, ছোরা-ছুরি, তরোয়াল-মুসলিম লিগের পতাকা সমেত একের পর এক উত্তেজিত মিছিল সার্কুলার রোডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের বিকট 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'— 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি আমাদের সন্ত্রস্ত করে তুললো। এর কিছুক্ষণ পরেই সেই মিছিল সার্কুলার রোডের হিন্দুদের বন্ধ দোকানগুলি ভেঙে একের পর এক লুঠপাট শুরু করল। মাঝে মাঝে মুসলমান গুণ্ডার দল সার্কুলার রোড থেকে এসে আমাদের পার্শিবাগানের রাস্তার মোড়ে জমায়েত হতে লাগলো। পার্শিবাগানের সব বাড়ি হিন্দুদের। বাড়ির সদর দরজা ও ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে আমরা বাড়ির ছাদ থেকে লুকিয়ে ওদের গতিবিধি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের গলির পরই হিন্দু মহল্লা শুরু। কিন্তু ওই বিশাল জেহাদি মুসলমান গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি ওই সময় ছিল না। ওই সময় টেলিফোনের এত সুবিধা ছিল না। যাদের ছিল তারা ক্রমাগত পুলিশে ফোন করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। পরে জানা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির নির্দেশে ওইদিন পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। রাস্তায়ও কোনো পুলিশ পোস্টিং ছিল না।

আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছিল সার্কুলার রোডের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ রূপ। তখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নিরীহ হিন্দু পথচারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা চলছিল। রক্তাপ্লুত দেহগুলি রাস্তায় যত্রতত্র ফেলে রাখা হচ্ছিল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক হাতে একটা ঝোলা নিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়তে দৌড়তে সার্কুলার রোড থেকে আমাদের পার্শিবাগানে আশ্রয়ের জন্য আসছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। পিছনে আসা গুণ্ডাদের লাঠির প্রচণ্ড আঘাত পড়ল মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে তাদের উদ্দাম উল্লাস 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'— 'আল্লাহু আকবর'। সকাল দশটার পর থেকে রাজাবাজারের বিভিন্ন দিক থেকে প্রবল হল্লার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আমাদের আশঙ্কা হলো এবার হয়তো ওরা হিন্দুদের বাড়িগুলোর দরজা ভেঙে লুটপাট-হত্যাকাণ্ড শুরু করবে। স্বভাবতই ভয়ে উদ্বেগে সব বাড়ির শিশু-মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করল। উপায়ন্তর না থাকায় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সার্কুলার রোডের দিকের পার্শিবাগানের সব বাড়ির বাসিন্দারা হিন্দুপল্লীর পড়শিদের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

সন্ধ্যা হলো। রাস্তায় আলো নিভানো। অন্ধকার পথ। সার্কুলার রোড থেকে মাঝে মাঝে দলবেঁধে কিছু লোক এসে পার্শিবাগানের বন্ধ বাড়িগুলির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। রাত প্রায় আটটা। কয়েকশো লোক মশাল-লাঠি-তরোয়াল হাতে 'আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলে পার্শিবাগানে ঢোকার প্রথম বাড়িটার গেট ভাঙতে শুরু করল। গেট ভেঙে পড়ল। সদর দরজা ভেঙে সমস্ত কিছু লুট হয়ে গেল। এমনকী ঘরের ফার্নিচারও বাদ গেল না। একের পর এক বাড়ির দরজা ভাঙা শুরু হলো। ঠিক সেই সময় পাশের হিন্দু মহল্লার অসমসাহসিক একদল যুবক এগিয়ে এল। তাদের রণমূর্তি। হাতে লাঠি, রড। 'বন্দে মাতরম্' আওয়াজ তুলে ঝাপিয়ে পড়ল ওই মুসলমান গুণ্ডাদের উপর। এদের প্রচণ্ড আক্রমণে বেশ কিছু মুসলমান গুণ্ডা হতাহত হয়ে পড়ল। তাদের নিয়ে গুণ্ডার দলটা রাজাবাজারের দিকে ফিরে গেল। ওই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ছেলেগুলি সারা রাত মহল্লায় পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। রাতে আর আক্রমণ হয়নি। ওই সময় দেবদূতের মতো যুবকরা না এগিয়ে এলে পার্শিবাগানের অনেক বাড়ি লুট হয়ে যেত। শুনেছিলাম ওই যুবকেরা আমাদের পাশের বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে বিপ্লবী পুলিন দাশের আখড়ার ছাত্র ছিল। রাত্রে মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কায় ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল।

পরের দিন ১৭ তারিখ থেকে শুরু হলো হিন্দুদের প্রস্তুতি। যেহেতু দূর থেকে অনেকটা দেখা যায় সেই কারণে আমাদের বাড়ির ছাদে বসল নিরবচ্ছিন্ন প্রহরা। সঙ্গে রইল বিউগিল-শঙ্খ-কাঁসরঘণ্টা। ছাদ থেকে নীচে গুণ্ডাদের মাথায় ফেলার জন্য ফুটন্ত গরম জলের ব্যবস্থা আর ইট। সার্কুলার রোড থেকে দল বেঁধে মুসলমান গুণ্ডাদের আসতে দেখলেই আমরা বিউগল-শঙ্খ-কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে শুরু করতাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মহল্লার ছেলেরা দলবেঁধে ছুটে আসতো। রাত্রে আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে টর্চ-লাঠি হাতে চলতো আমাদের ছেলেদের নাইটগার্ড। রাত্রে-দিনে মাঝে মাঝেই আল্লাহো-আকবর আওয়াজ তুলে দলবেঁধে ওই গুণ্ডার দল সার্কুলার রোড থেকে ভিতরে আসার চেষ্টা করত কিন্তু আমাদের ছেলেরা রুখে দাঁড়ানোয় তা সম্ভব হয়নি। এই ভাবে তিন চার দিন চলার পর হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের প্রতিআক্রমণ শুরু করতেই সুরাবর্দি সরকার মিলিটারি নামিয়ে কলকাতায় সান্ধ্য আইন জারি করল। ধীরে ধীরে দাঙ্গার তীব্রতা কমে এল। সাত আট দিন পরে লোক চলাচল শুরু হলো। কিন্তু পারতপক্ষে হিন্দুরা তখন মুসলমান পাড়ায় এবং মুসলমানরা হিন্দুদের পাড়ায় যেত না। গেলে ছুরি মারার ঘটনা ঘটে যেত। দাঙ্গার পরেও বহুদিন পর্যন্ত দেখেছি রাজাবাজারে সার্কুলার রোডের ধারে ফুটপাতে বাড়ির লুঠ করা জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য মেলা বসে যেত। এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র আমার প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিবরণী। সারা বাংলায় দাঙ্গার ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড লুঠ ও অত্যাচারের বর্বরচিত বিবরণ এবং অবিভক্ত বাংলাদেশের বিধানসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দাঙ্গা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষণ ইতিপূর্বে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং গ্রন্থে। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমানদের পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র উপহার দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু আজও আমাদের দেশ সাম্প্রদায়িকতার হলাহল থেকে মুক্ত হয়ে সুপরিণত ও সুরপরিকল্পিত প্রগতির পথে এগিয়ে চলার রাস্তা পায়নি। ■

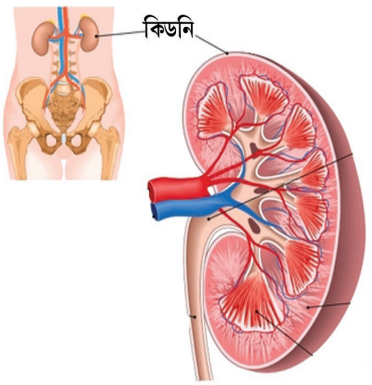

অতিরিক্ত লবণ কিডনির পক্ষে ক্ষতিকর

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রত্যেক মানুষের দুটি কিডনি থাকে এবং মেরুদণ্ডের দুপাশে এদের অবস্থান। একটি কিডনি খারাপ হলেও কাজ চলে যায়। তাছাড়া কিডনি খারাপ হওয়ার সঙ্গে শরীরের নানা উপসর্গও দেখা দিতে পারে। এই সব কারণে প্রথম থেকেই সাবধানতা মেনে চলতে হবে।

কিডনি আমাদের শরীরে জলের পরিমাণে সমতা রাখে। শরীরের লবণের পরিমাণ সঠিক রাখে। শরীরে নানা জলীয় অংশের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখে। বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কিডনির প্রদাহকে নেফ্রাইটিস বলে। নেফ্রাইটিস তিন রকমের হয়। অ্যাটিউট নেফ্রাইটিস, নেফ্রোটিক সিনড্রোম এবং ক্রনিক নেফ্রাইটিস। এছাড়া জীবাণু সংক্রমণ, কিডনিতে স্টোন, সিস্ট, ক্যানসার সহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে।

কিডনির অসুখ থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু সামান্য নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রথমে জানতে হবে কী অসুখে কিডনি খারাপ হতে পারে। হাই ব্লাডপ্রেসার এবং সুগার দুটো রোগই অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই দুটো অসুখেই কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কিছু অসুখ আছে যা যে-কোনও সময় যে-কোনো বয়সের মানুষের হতে পারে। তেমনই একটি অসুখ নেফ্রাইটিস। কিন্তু রোগ ধরা পড়ার পর নিয়মিত চিকিৎসা করে যেতে হবে।

নেফ্রাইটিস হলে নানা লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন হাত-পা ফুলে যায়। প্রস্রাব কমে যাওয়া, চোখ মুখ ফোলা, রক্তচাপ বেশি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে রুটিন ইউরিন চেক-আপ করা প্রয়োজন। যদি দেখা যায় ইউরিনের মাধ্যমে প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা ইউরিনে ব্লাড যাচ্ছে তখন সেই রোগীকে আমরা নেফ্রাইটিস রোগী বলে চিহ্নিত করি। নেফ্রাইটিসেরও অনেক ভাগ আছে। কিছু নেফ্রাইটিস আছে চিকিৎসা করালে সেরে যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ ব্যাপার হলো নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোম অনেক সময় চিকিৎসা না করলেও ভালো হয়ে যায়। অনেক সময় চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করা হয়। তবে আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এক ধরনের নেফ্রাইটিস আছে, যা রোগীর হাইব্লাডপ্রেসার বাড়িয়ে দেয়। নিশ্চিতভাবে নেফ্রাইটিস চিহ্নিত করতে কিডনির বায়োপসির প্রয়োজন। এছাড়া কিডনি সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যথা উপশম করা ওষুধ (পেইনকিলার) বন্ধ করতে হবে। যদি কেউ ব্যথার ওষুধ অনেক দিন ধরে খান তবে কিডনি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আরও কিছু অসুখ আছে যেগুলি চিকিৎসা ঠিকমতো হলে কিডনি সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

যেমন, পুরুষদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যা। এক্স-রে বা ইউএসজি করলে যদি দেখা যায় প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড়ো তাহলে বুঝতে হবে ব্লাডারে আরও ইউরিন থেকে যাচ্ছে এবং যা কিনা কিডনির ওপর অনেকটাই চাপ দিচ্ছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে কিডনি রোগীর গর্ভসঞ্চার বিপদ ডেকে আনতে পারে। আসলে হাইপ্রেসার বা কিডনি গুরুতর জখম থাকলে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের জীবনের ঝুঁকি থাকে বলে গর্ভধারণে নিষেধ করা হয়। কিডনি সুস্থ রাখতে প্রতিদিন দু-তিন লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন। আমাদের খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রোটিন। প্রোটিন আমাদের শরীরের প্রয়োজনে লাগে দৈনিক কাজকর্মে, শরীর গঠনে। কিন্তু কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। ফলে প্রোটিন ভেঙে যেসব বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয় তা শরীর থেকে না বের হওয়ার ফলে শরীরের ক্ষতি করে।

তাই এ সময়ে স্বাভাবিকের থেকে কম পরিমাণ প্রোটিন খাওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত মাছ, ডাল, দই, ডিম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাই ভালো। ফ্যাট আমাদের রোজকার খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু স্যাচুয়েটেড ফ্যাট রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় ও হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা ডেকে আনে। তাই ঘি, মাখন, চর্বি জাতীয় খাবার যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

বেশি লবণ যুক্ত খাবার উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা বাড়ায় এবং কিডনি ও হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত নুন, নোনতা, বিস্কুট, সল্টেট বাদাম, প্রসেসড ফুড ও ক্যানড্ ফুড, টম্যাটো সস ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। বিভিন্ন রকম ফল ও সবজিতে পটাসিয়ামের আধিক্য থাকে। কিডনির সমস্যা থাকলে রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকে। বেশি থাকলে আলু, রাঙালু, সব ধরনের ডাল, টম্যাটো, সিম, বিন, ডুমুর খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে হবে। কমলালেবু, কলা, আঙুর, তরমুজ, আম, লিচু, বেল ইত্যাদিতে খুব বেশি পরিমাণ পটাসিয়াম থাকে। এগুলো তাই পরিমাণ মতো খেতে হবে।

কিডনির সমস্যায় শরীরের জল বা তরল পদার্থ জমার একটি প্রবণতা থাকে। এই অতিরিক্ত ফ্লুইড শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ তা হৃদযন্ত্রে ও কিডনিতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তরল গ্রহণ করুন।

মোবাইল : ৯৮৩০০২৩৪৮৭

যোধপুরের নগরদূত প্রত্যুষ যোশী

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমরা যখন দেখি পাড়ার গলির লাইটটা জ্বলছে না কিংবা পুরসভার জল ঠিকমতো আসছে না, তখন আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই সরকারের সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। উদ্যোগের অভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু যোধপুরের চব্বিশ বছরের ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যুষ যোশীর ভাবনাচিন্তা একটু অন্যরকম। তিনি যোধপুর শহরের নাগরিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে চান। এখনও পর্যন্ত যোধপুর শহর ও তার আশেপাশের রাস্তাঘাট, রাস্তার আলো, নর্দমার নোংরা জল এবং পানীয় জল সংক্রান্ত ১০০টি সমস্যার সমাধান করেও ফেলেছেন।

কিন্তু প্রত্যুষের মতো একজন তরুণ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে সারাদিন সরকারি অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা কতদূর সম্ভব? প্রশ্ন শুনে প্রত্যুষ বলেন, 'একজন সাধারণ মানুষ ইচ্ছে করলেই সরকারি ওয়েব পোর্টালের সাহায্যে নাগরিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তার জন্য সরকারি অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকার বা ধরনা দেবার দরকার নেই।'

মানুষকে তার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যুষ বলেন, 'আমার পাড়ায় গারবেজ বিন ছিল না। জঞ্জাল ফেলার কর্মীও নিয়মিত আসতেন না। এই নিয়ে ২০১৪ সালের ২২ জুলাই আমি সরকারি ওয়েব পোর্টালে অভিযোগ করি। এটাই ছিল আমার প্রথম উদ্যোগ। বললে বিশ্বাস করবেন না, পরের দিনই যোধপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে একটা ফোন পেলাম। আমার সঙ্গে কথা বলে আধিকারিকেরা সরেজমিনে তদন্তে এলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পাড়ায় গারবেজ বিন চলে এল।'

প্রত্যুষরা আগে যোধপুরের শহরতলিতে থাকতেন। ২০১৪ সালে তারা ছোপসানি হাউজিং বোর্ডের অধীনস্থ আবাসনে উঠে আসেন। নতুন জায়গায় আসার পরেই নানারকম নাগরিক অস্বাচ্ছন্দ্য তার চোখে পড়ে। কিন্তু নিত্যদিন ঝামেলা সহ্য করেও সেখানকার মানুষ ছিলেন নির্বিকার। 'প্রত্যুষ বলেন, 'নতুন জায়গায় এসে এমনিই ঘুরে বেড়াতাম। তখনই চোখে পড়ত চলাচলের অযোগ্য রাস্তাঘাট, ভাঙা স্ট্রিট লাইট। একদিন ঠিক করলাম এসবের প্রতিকার করতে হবে। রাজস্থান সরকারের ওয়েব পোর্টাল 'রাজস্থান সম্পর্ক'-এর কথা আগেই শুনেছিলাম। এও শুনেছিলাম, এই পোর্টাল এবং সরকারি ওয়েবসাইটে অভিযোগ করলে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। বলতে পারেন, সরকারের গড়ে তোলা ডিজিটাল রিড্রেসাল সিস্টেমের সাহায্যেই আমি সাফল্য পেয়েছি।'

প্রত্যুষের উদ্যোগ শুধুমাত্র তার নিজের এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত তার প্রচেষ্টার সুফল পেয়েছেন নিকটবর্তী পালি এবং বারকার অঞ্চলের মানুষও। 'সম্পর্ক' পোর্টালের কার্যকারিতা বুঝে নেওয়ার পর তিনি যোধপুর তহশিলের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামগুলিও বাদ পড়ে না।

গ্রামে কাজ করার কথা বলতে প্রত্যুষ বলেন, 'আমার এক আত্মীয় পালি জেলায় থাকেন। নাম মানবেন্দ্র ব্যাস। ওদের গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা অনেকদিনের। শহর থেকে ট্যাঙ্কার ভাড়া করে না নিয়ে গেলে খাবার জল পাওয়া যেত না। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে বহুবার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। সব জানার পর আমি একদিন বিষয়টা তথ্যপ্রমাণ-সহ পোর্টালে তুলে দিলাম। এর কিছুদিনের মধ্যেই ওই গ্রামে পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হলো এবং এক মাসের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ চালু হয়ে গেল। এর ফলে প্রায় ১০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।'

ডিজিটাল-বিশ্বের মানুষ হওয়ার সুবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়া সম্বন্ধেও প্রত্যুষের স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ড্রিম প্রোজেক্ট হিসেবে দেখা ভুল হবে। দেশকে ডিজিটালাইজড করার ব্যাপারে এই প্রোজেক্ট আমাদের সবার সামনে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্রকল্প সরকারকে আরও দায়বদ্ধ এবং স্বচ্ছ করে তোলার একটা মাধ্যম হতে পারে। এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমেই আমরা দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলতে পারি।' ■

কলকাতার ফুটবলের আদিপর্ব

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত জুড়ে চলছে ফুটবল উৎসব। একদিকে আই এস এল অন্যদিকে আইলিগ। সারা দেশের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী বুদ হয়ে আছেন এই ফুটবল উৎসবে। কদিন আগেই শেষ হয়ে গেল ফিফা যুব বিশ্বকাপ। এই ফুটবল কার্নিভালের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ফুটবলের তীর্থ কলকাতা মাঠের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোকপাত।

বাংলা ও বাঙালির রক্তে ফুটবল। কলকাতা ফুটবলের পীঠস্থান। কলকাতার ফুটবল ভারতের গর্ব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুণী খেলোয়াড়রা এখানে এসেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। জাতি-ধর্ম-ভাষার ভেদাভেদ ভুলে সবাইকেই কাছে টেনে নিয়েছে কলকাতা। এই গড়ের মাঠেই ফুটবল খেলে সবার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন হাফিজ রসিদ, জুম্মা খাঁ, সামাদ, পাগসলে, লক্ষ্মীনারায়ণ, মুগেশ, আপ্পারাও, শৈলেন মান্না, বেঙ্কটেশ, শরৎ দাস, টি আও, মেওয়ালাল, নায়ার, রমন, আমেদ খান, ফকরি, মুসা, সাত্তার, সন্তোষ নন্দী, নিখিল নন্দী, বদ্রু ব্যানার্জি, বলরাম, চুনী, পিকে, অরুণ ঘোষ, থঙ্গরাজ, প্রদ্যুৎ বর্মণ, জার্নেল সিংহ, রামবাহাদুর, কোন্দিয়া, মজিদ, চিমা, এমেকা, সুধীর কর্মকার, শ্যাম থাপা, হাবিবরা। খুঁজলে এরকম অসংখ্য নাম পাওয়া যাবে। এঁদের অনেকেই আবার বিদেশ থেকে এসেছেন এবং খেলে সবার মন জয় করেছেন।

কলকাতা ফুটবলের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে আমাদের চলে যেতে হয় অনেক পিছনে। পরাধীন ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেই ফুটবল আমাদের শহরে প্রবেশ করে। সরকারি কর্মী, ব্যবসায়ী, রেজিমেন্টের সৈন্যরা এবং ইউরোপিয়ান শিক্ষকরাই এই ফুটবল খেলায় অংশ নিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচ থেকে সাত দশকের মধ্যে সংগঠিত ফুটবলের পূর্ব পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার মধ্যেই প্রাথমিক পর্ব অতিবাহিত হয়েছে।

যতদূর জানা যায় ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় প্রথম ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল 'ক্যালকাটা ক্লাব অব সিভিলিয়ান্স' এবং 'জেন্টেলম্যান অ্যান্ড ব্যারাকপুর'। চোদ্দ বছর পর ১৮৬৮ সালে 'এটোনিয়ান' বনাম

'অবশিষ্ট একাদশে'র খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় এটোনিয়ানরা তিন গোলে জয়লাভ করে। রবার্ট ভ্যানসিটার্ট একাই দুটি গোল করেন। বিবাদিবাগে ভ্যানসিটার্ট রো আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই বিরাট ফুটবল খেলোয়াড়টিকে। এরপর নিয়মিত খেলা হতো। পাবলিকের মধ্যে এত উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল যে সেই সময়ের বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর খালি পায়ের বাঙালি ছেলেদের ইউরোপিয়ান ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলা দেখতে চেয়েছিলেন। শোভাবাজারের সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছেলেদের খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই ম্যাচের রিপোর্ট দৈনিক ইংলিশম্যান পত্রিকায় ছাপা হয়। শোভাবাজার ক্লাব ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস সৃষ্টি করে ট্রেডস কাপে অংশ নিয়ে। তার আগে শুধু মিলিটারি ও ইউরোপিয়ান ক্লাব অংশ নিত।

১৮৯২ সালে মিলিটারি দলের বিপক্ষে শোভাবাজার প্রথম জয়লাভ করে। এই ঘটনা কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তা সাগরপারে পৌঁছয়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এর উল্লেখ করা হয়।

শোভাবাজারের পরপরই কলকাতা ময়দানে আত্মপ্রকাশ করে একে একে কুমোরটুলি, এরিয়ান, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং। মহামেডান স্পোর্টিং ভারতবর্ষের সেরা মুসলমান খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়ে ব্রিটিশ টিমগুলিকে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। আর আদ্যন্ত বাঙালি খেলোয়াড়পুষ্ট মোহনবাগান ১৯১১ সালে বাঘাবাঘা ব্রিটিশ সামরিক দলকে হারিয়ে আই এফ এ শিল্ড জিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন মাত্রা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। যা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বিপ্লবীরা সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুথবদ্ধ আন্দোলনে। সব মিলিয়ে মোহনবাগান, এরিয়ান ও শোভাবাজার যেমন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার ফুটবলে এক দিকচক্রবাল রচনা করেছিল। নানা বিপ্লবের বহ্নিশিখাও জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তৎকালীন বঙ্গ সমাজকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছিল। ■

রসিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

একবার রবীঠাকুর এক সংগীতের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন আসরে গান গাইছিলেন ধ্রুপদ শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি তাঁর গান শুনে মুগ্ধ। গোপেশ্বরের গান শেষ হলে উদ্যোক্তারা কবিগুরুকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং রসিকতা করে বললেন— 'বুঝেছি, বুঝেছি, গোপেশ্বরের পর এবার তাহলে দাড়িশ্বরের পালা!' কবিগুরুর একথা শুনে হাসির রোল উঠল।

তাঁর কাছে নানা সময়ে নানা ব্যক্তি আসতেন। একদিন সন্ধ্যায় শিকারি কুমুদনাথ চৌধুরী কবিগুরুর কাছে এলেন এবং বললেন, 'গুরুদেব, আপনি কখনোও বাঘ মেরেছেন?' সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে গুরুদেব উত্তর দিলেন— 'বাগ মারা? তা এক-আধটা নয় ভাই, বোধহয় গুণে শেষ করতে পারবে না', শুনে তো কুমুদনাথ অবাক! তিনি গুরুদেবকে লেখক ছাড়া শিকারি হিসেবে জানতেন না! তাই নিজে বাঘ মেরে এসে তার গল্প বলে গুরুদেবকে চমকে দিতে ভেবেছিলেন। এখন তিনি গুরুদেবের কথায় নিজেই চমকে গেলেন এবং চুপ করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কবিগুরুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুদেব, আপনি সত্যিই বাঘ মেরেছেন?' এবার রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বাগ বা ছারপোকা তো অনেক মেরেছি, কিন্তু বাঘ বা টাইগার মারিনি।'

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কুমুদনাথ এবং সগর্বে তাঁর বাঘ শিকারের গল্প জুড়ে দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দ খুব রসিকমনের ছিলেন। তিনি রসিকতা করে অন্যদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করতেন। একদিন তিনি সকালবেলায় মিস্টার স্টার্ডি ও মিস্টার গুডউইনের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিলেন, কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ গুডউইন বলে উঠলেন, 'জানেন তো, কোনো মানুষ যখন কোনো গাধাকে প্রহার করে আমার তখন খুব রাগ হয়। এই কথা শুনে বিবেকানন্দ ভাবলেন যে গুডউইন ইংরেজ, ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার করে। অথচ তাদেরই আবার গাধার ওপরে এত দরদ! তাই স্বামীজী তাঁকে শিক্ষা দিতে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন মশায়, গাধাকে মারলে আসলে আপনার স্বশ্রেণীর প্রতি প্রেম উথলে ওঠে, তাই কষ্ট হয়।' এই কথা শুনে 'একটা জরুরি কাজ আছে, এখন আসি' বলে গুডউইন লজ্জায় দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

আর একদিন আমেরিকায় এক জনের সঙ্গে স্বামীজী গল্প করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোকটি বিবেকানন্দকে জিগ্যেস করলেন, 'শুনেছি, আপনাদের দেশে নাকি কন্যাসন্তান জন্মালে জলে ফেলে দেওয়া হয়?" তার মুখে এমন অশিক্ষিতের মতো প্রশ্ন শুনে স্বামীজীর মাথা গরম হয়ে গেল। তাও তিনি রাগ সংবরণ করে মুখে কিঞ্চিৎ হাসি এনে বললেন, 'ও তাই? তাহলে এটাও নিশ্চই জানেন যে ভারতবর্ষে পুরুষেরা সন্তান প্রসব করে? 'স্বামীজীর থেকে উপযুক্ত জবাব পেয়ে বিদেশিটি আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না।

দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) :

দাদাঠাকুর তখন স্কুলের ছাত্র। তিনি এডেড স্কুলে পড়েন। একদিন স্কুলে 'বিদ্যালয় পরিদর্শক' আসবেন বলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং সকলের জন্য ভালোমন্দ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। দাদাঠাকুর দেখলেন খাদ্যের তালিকায়— ডাল, ভাত, শুক্তো, মাছ প্রভৃতি শ্রাদ্ধবাড়ির মতো ব্যবস্থা রয়েছে। তখন তিনি তাঁর সহপাঠীকে বললেন, 'দেখ, স্কুলের শ্রাদ্ধ হচ্ছে।' এই কথা এক শিক্ষক মশার শুনে ফেলেন এবং তাঁকে এক পা তুলে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন। তখন দাদাঠাকুর বললেন, 'স্যার, আমায় এই অবস্থায় দেখলে বিদ্যালয় পরিদর্শক কী ভাববেন বলুন তো? তা ছাড়া এখানে তো সত্যি শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়েছে। এটি এ-ডেড (একটি মৃত) স্কুল, এর তো শ্রাদ্ধ করতেই হবে, তাই না?' দাদাঠাকুরের কথায় শিক্ষক মশায় হেসে ফেললেন এবং দাদাঠাকুরকে শাস্তি থেকে রেহাই দিলেন।

দাদাঠাকুর তখন 'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক। তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি। তাঁরা দুজনেই একসভায় একসঙ্গে আমন্ত্রিত হয়েছেন। দাদাঠাকুরকে দেখে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন, 'এসো, বিদূষক শরৎচন্দ্র'। দাদাঠাকুর তাতে বিন্দুমাত্র না রেগে চুপ করে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাই দেখে শরৎচন্দ্র বললেন, 'কী দেখছ হে বিদূষক শরৎচন্দ্র?' দাদাঠাকুর এবার রসিকতা করে বললেন, 'আজ্ঞে, চরিত্রহীন শরচৎচন্দ্রকে।' এই শুনে সভার সবাই হেসে উঠলেন।

রূপষা দেবনাথ

ভারতের পথে পথে

নলাটেশ্বরী মন্দির

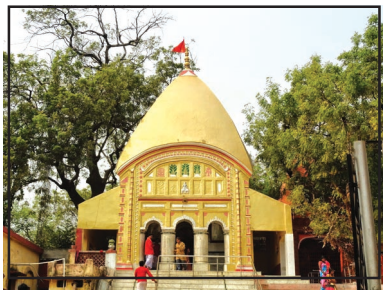

বীরভূম জেলার নলহাটি শহরে মা নলাটেশ্বরী মন্দির। ৫১ পীঠের এটি একটি শক্তিপীঠ। এখানে মা সতীর গলা পতিত হয়েছিল। জেলা সদর রামপুরহাট দূরত্ব মাত্র ১৬ কিলোমিটার। নাটোরের রানি ভাবানী প্রথম মন্দির তৈরি করান। ১৮৯০ সালে নশিপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করান। দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজার আগে বছরে দু'বার মহাধুমধাম করে ৯ দিন ধরে নবরাত্রি উৎসব পালিত হয়।

লোকের বিশ্বাস এখানে মানত করলে মা নলাটেশ্বরী মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

ইদানীং মযা অপি অন্যত্র গন্তব্যম্।
এখন আমাকেও অন্যত্র যেতে হবে।
ভবান্ স্বকার্য পশ্যতু।
তুমি নিজের কাজ দেখ।
শীঘ্রং প্রত্যাগমিষ্যামি।
তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।
আবশ্যকং চেত্ শ্বঃ আনেষ্যামি।
দরকার হলে কাল আনব।
'মাস্তু' ইত্যুSক্তেপি সঃ ন শৃণোতি।
মানা করলেও সে শোনে না।

ভালো কথা

কুকুর-দাদু

বিষ্ণুপুরের বলাই দাদুর নাম কেনা জানে। তাঁর কথা এখনো আমার খুব মনে পড়ে। পৌষ সংক্রান্তির দিন দাদুর বাড়িতে রাশি রাশি পিঠে-পুলি হতো। আমরা ভাবতাম এত কী হবে। পরদিন সকালে দাদু ও দিদা সেই পিঠে-পুলি নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতেন। পঞ্চাশ-ষাটটি কুকুর ছুটে এসে দাদু-দিদাকে ঘিরে দাঁড়াতো। দাদুর বাড়ির লোকেরা মাটির সরা সারি সারি রেখে তাতে পিঠেপুলি দিত। সব কুকুর এক একটা সরা বেছে নিয়ে খেয়েদেয়ে কোথায় চলে যেত। আমরা দাদুকে কুকুর-দাদু বলতাম। দাদু রাগ করতেন না। দাদু বলতেন, এরা রাস্তার জীব। এদের খাওয়ালে পুণ্য হয়।

সুমন আচার্য, একাদশ শ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শু রা প র	(১) না বা নী হি সে
(২) ধী ন তা রা	(২) ভা ত র্ষ র ব

২০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হরিবাসর (২) সভাসমিতি

২০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) পাতাবাহার (২) পোকামাকড়

উত্তরদাতার নাম
(১) সৌরীন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, বর্ধমান। (২) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৩) শুভদীপ ঘোষ, সরকারপাড়া, পুরুলিয়া (৪) পুষ্কর সরকার, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ৩

কৌরবেরা চক্রান্ত করল।

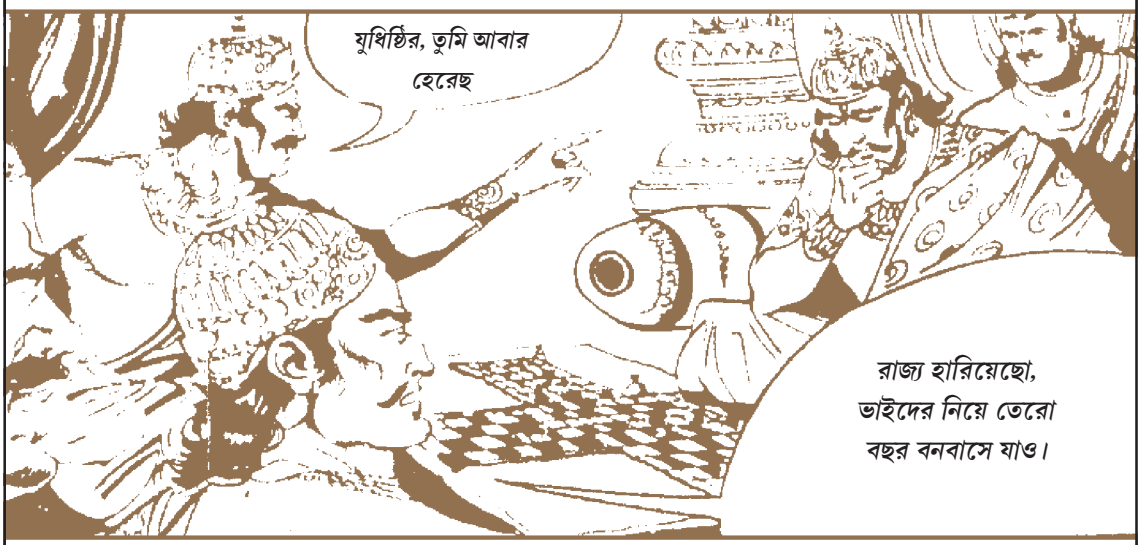

পাণ্ডবেরা বনবাসে যান। দুঃখিত সাধারণ মানুষ তাঁদের বিদায় জানায়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
4 December - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা ।।